KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৭/2 দুর্গা পিতুরি লেন, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : কে. সি. মুখার্জী
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৬/২	Year of Publication : পৌষ, ১৩৪৭
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : হুমায়ুন কবির	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

ঘোষ
মার সেনগুপ্ত
ন্দ্যো াধ্যায়
াল রায়
ন রায়
সিংহ
াচার্য্য
সাদ মুখোপাধ্যায়
ত্র
াপাধ্যায়
ন
আলি
য়
া'
হোসেন

খ্যা বারো আনা
৩ৃ০ আনা

তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা
পৌষ ১৩৪৭

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সম্পাদক
হুমায়ুন ক

ঈস্টর্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে

বড়দিনের আমোদ উপভোগ করিতে হইলে
পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে ভ্রমণ করুন।

আপনার মনোমত স্থান এই রেলপথের পার্শ্বেই পাইবেন।

বড়দিন উপলক্ষে সুলভ মূল্যে

যাতায়াতী কনসেশন টিকিট

ভাড়ার হার: **(অন্যূন ৬৬ মাইলের উপর)**

১ম, ২য় ও মধ্যম শ্রেণী	... ...	১⅓ ভাড়ায় যাতায়াত
৩য় শ্রেণী (১৫০ মাইল পর্য্যন্ত)	...	১⅓ „ „
৩য় শ্রেণী (১৫০ মাইলের উপর)	...	১½ „ „

বিক্রয়ের তারিখ—১৩ই ডিসেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত।

ফিরিবার অংশের মেয়াদ—১৪ই জানুয়ারী (১৯৪১) মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত।

যাত্রা-বিরতি—যাতায়াতের পথে যে কোন স্টেশনে নামা যাইবে, তবে একই লাইনের একদিকে একবারের বেশী যাওয়া চলিবে না।

অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে ও স্টীমার কোম্পানীর সহিত একযোগেও এই টিকিট পাওয়া যাইবে।

বড়দিনের ছুটিতে যাঁহারা বহুস্থান দর্শন করিতে চাহেন তাঁহারা

অবাধ ভ্রমণ টিকিট

ক্রয় করুন।

মূল্য :—

১ম শ্রেণী—৭১৷৶০	মধ্যম শ্রেণী—১৫৸৶০
২য় „ —৫৩৵০	তৃতীয় „ —১০৷৵০

বিক্রয়ের তারিখ—১৩ই ডিসেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত।

১৫ দিন ব্যাপী ঈ বি রেলের সর্ব্বত্র অবাধে ভ্রমণ করুন। মনে রাখিবেন, বাংলার যথার্থ পরিচয় পাইতে হইলে ঈ বি রেলপথে পর্য্যাপ্ত ভ্রমণ অপরিহার্য্য।

দ্রষ্টব্য :—বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ের উপর এই টিকিট চলিবে না।

নং পি। ২৩৯। ৪০

ট্রাফিক ম্যানেজার

কলিকাতা লিটল্ ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

চতুরঙ্গ

তৃতীয় বর্ষ] পৌষ, ১৩৪৭ [দ্বিতীয় সংখ্যা

কাণ্টীয় স্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষজ্ঞান

বটকৃষ্ণ ঘোষ

কাণ্টীয় দর্শনের গোড়ার কথা হইল স্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষজ্ঞান (synthetic judgment a priori)। Kant তাঁহার প্রধান গ্রন্থ "Kritik der reinen Vernunft"-এ দেখাইয়া গিয়াছেন কিরূপে এই স্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষজ্ঞান সম্ভব হয়; প্রকৃতপক্ষে ইহাই হইল তাঁহার এই Kritik-এর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু কোন বিষয় প্রমাণ করিতে অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বে বিবেচনা করা দরকার সেই বিষয়টি বাস্তবিকই প্রমাণের উপযুক্ত কি না। প্রথমতঃ বিবেচ্য, যাহারই অস্তিত্ব আছে তাহাই যে প্রমাণ করা যায় একথা সত্য না হইলেও ইহা ঠিক যে যাহা নাই তাহা প্রমাণ করা যায় না। সুতরাং যদি দেখান যায় যে স্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে অলীক কল্পনা মাত্র তবে আর তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়ার কোন সার্থকতাই থাকে না। Kant কিন্তু দেখাইয়াছেন যে ইহা অলীক নহে, বাস্তব। ইহাই হইল তাঁহার "Kritik der reinen Vernunft" লিখিবার পক্ষে যুক্তি, apology ও argument। Kant কিরূপে দেখাইয়াছিলেন যে স্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষজ্ঞান অলীক নহে তাহাই এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়। কিরূপে Kant-এর মতে এই সংশ্লেষজ্ঞান সম্ভব হয় তাহা বাঙ্গালী পাঠক এখন অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর প্রণীত "ইমানুয়েল কাণ্ট্" পড়িয়া কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বাংলা ভাষায় Kant-সম্বন্ধে গ্রন্থ ইহাই বোধ হয় প্রথম। গ্রন্থকারের সকল কথায় সকলেই যে সায় দিতে পারিবেন তাহা নহে,—আমি পারি

নাই। কিন্তু কাণ্টীয় দর্শনপ্রস্থানের পরিচয়পুস্তক রূপে ইহা যে একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তাহা পাঠক মাত্রই স্বীকার করিবেন।

কোন দার্শনিক মতবাদই সাময়িক পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে বুঝিতে পারা যায় না, কাণ্টীয় দর্শন তো নহেই। Socrates হইতে আরম্ভ করিয়া Kant-এর পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপে বহু বিভিন্ন দর্শন প্রসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু এই বৈবিধ্য সত্ত্বেও বিবিধ মতাবলীর ভিত্তি ছিল প্রায় অভিন্ন। প্রত্যেক দর্শনেই "প্রমাণ" করা হইত যে সমগ্র বাহ্য ও অন্তর্জগৎ একটি বা কয়েকটি নির্দিষ্ট নীতির অনুবর্তী। প্রমাণ যে প্রকৃতপক্ষে হইত না তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তথাপি, বাহ্য ও অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ও জ্ঞানলাভের উপায় তখন এতই অল্পপরিসর ছিল যে প্রতিষ্ঠিত মতবাদের সহিত কোন উপলব্ধ তথ্যের অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইলেও লোকে নতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইত, তথ্যনির্ণয়েই ভ্রান্তি ঘটিয়াছে, মতবাদ নির্ভুল। মধ্যযুগীয় জ্ঞানবিমুখ ধর্মান্ধতাও এই বিকৃত মনোভাবের পুষ্টিসাধন করিতেছিল। Kant-এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী যুগে কিন্তু ফলিতবিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলে মানুষ নিজের উপর খানিকটা আস্থা ফিরিয়া পাইয়াছিল, এবং পাইয়া তাহার অসদ্ব্যবহারও আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। Kopernicus, Galileo প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের সাধনার ফলে জগৎ সম্বন্ধে তখন মানুষের জ্ঞান অবশ্যই পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু যতটা জানিলে "জানি না" বলা যায় ততটা মানুষ তখনও শিখে নাই। কাজেই অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক, এবং তাঁহাদের অনুকরণে কতকগুলি দার্শনিকও, বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে যাহা ইন্দ্রিয়গোচর হয় না তাহার অস্তিত্বই নাই। এবং ইহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আর এক দল দার্শনিক বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে লোকে যাহা জানিতে পারে বলিয়া মনে করে তাহার সবই মিথ্যা।

Kant-এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী দার্শনিক মতাবলী সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে : অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism) ও বুদ্ধিবাদ (Rationalism)*। Bacon অভিজ্ঞতাবাদের প্রবর্তক, যদিও তাঁহাকে এই মতের প্রতিষ্ঠাতা বলা চলে না। Bacon-প্রবর্তিত অভিজ্ঞতাবাদকে প্রকৃতপক্ষে দর্শনপ্রস্থানে (system of philosophy) উন্নীত করিয়াছিলেন Hobbes, কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদকে প্রকৃতিবাদের (Naturalism) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়া তিনি যে Bacon-এর দর্শনের চরিত্র অনেকটা পরিবর্তন করিয়া

* Descartes প্রভৃতি বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণের মতের উল্লেখ এখানে না করিলেও চলিবে।

ফেলিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দর্শনের দিক হইতে Bacon-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই যে তাঁহার মতে সকল প্রকার জ্ঞানই অভিজ্ঞতালব্ধ; অর্থাৎ অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণের ফলে জগৎপ্রপঞ্চ সম্বন্ধে যে প্রতীতি জন্মে তাহাই ছিল Bacon-এর মতে তত্ত্বজ্ঞান, এবং বাহ্য ও মনোজগৎ ভিন্ন আর যে কিছু এই তত্ত্বজ্ঞানের গ্রাহ্য বিষয় হইতে পারে তাহাও Bacon স্বীকার করিতেন না। Bacon-এর দর্শনে লোকোত্তর (transcendental) জ্ঞানের কোন স্থান নাই এবং সেই জন্যই তাহা আধুনিক বিজ্ঞান (science) হইতে পৃথক্ করাও যায় না। Bacon-এর প্রভাবে অনুমানাত্মক মনস্তত্ত্ব (Theoretical Psychology) ও ঈশ্বরতত্ত্বও (Theology) দর্শনের ক্ষেত্র হইতে নির্বাসিত হইল, এবং পরাবিদ্যা (Metaphysics) হইয়া পড়িল নিসর্গতত্ত্বের (Natural Philosophy) দাসী। এক কথায়, Bacon-এর দর্শনে পরাবিদ্যা হইল পদার্থবিদ্যারই (Physics) de-luxe সংস্করণ।

অভিজ্ঞতাকেই বুদ্ধ্যুৎপত্তির একমাত্র হেতু বলিয়া প্রচার করিলেও Bacon কিন্তু দেখাইয়া যান নাই এই অভিজ্ঞতা প্রকৃতপক্ষে কি বস্তু। তথাকথিত অভিজ্ঞতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আরম্ভ করেন Locke, যাঁহার দর্শন সংবেদনবাদ (Sensualism) নামে সুপরিচিত। Locke বলিলেন, সর্বপ্রকার বুদ্ধির মূল সামগ্রী হইল সুপরিচ্ছিন্ন (simple) ও বাহ্যলব্ধ প্রতীতি (impression) অথবা কল্পনা (idea), যাহা যথাক্রমে সংবেদন (sensation) ও মননের (reflexion) দ্বারা উপলব্ধ হইয়া থাকে। Locke এইরূপে Bacon-এর মত স্ফুটতরভাবে প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তাঁহার দ্বারা Bacon-এর মত সংকুচিতও হইয়াছিল। কারণ Bacon যেখানে সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতাকেই বুদ্ধির উৎপাদক বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন Locke সেখানে বলিলেন কেবল সংবেদক অভিজ্ঞতা হইতেই বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং কেবল সংবেদক বস্তুই হইল বুদ্ধির বিষয়; যাহা সংবেদনার অতীত তাহা Locke-এর মতে বুদ্ধিরও অতীত। Locke-এর মতে কিন্তু বস্তুর যাহা বস্তুত্ব তাহা কখনই বুদ্ধিতে ধরা দেয় না, বস্তুর যাহা গুণাবলী ও বিকাশরূপ তাহাই কেবল বুদ্ধির দ্বারা গৃহীত হয়; অর্থাৎ ঈশ্বর ও আত্মার মত বস্তুর বস্তুত্বও জ্ঞানোত্তর। সৃষ্টিতত্ত্ব (Cosmology), মনস্তত্ত্ব (Psychology) ও ঈশ্বরতত্ত্ব (Theology) এই তিন বিষয়েই Locke-এর মতে স্বলক্ষণ বস্তু (Ding an sich) হইল অজ্ঞেয়।

Locke-এরই পদাঙ্কানুসরণ করিয়া Berkeley তাঁহার সুবিখ্যাত কল্পনাবাদে (Idealism) উপনীত হ'ন। Locke বলিয়াছিলেন, স্বলক্ষণ বস্তু অজ্ঞেয়; Berkeley কিন্তু বলিলেন বস্তুর অস্তিত্বই নাই, সুতরাং তৎসম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞানও অসম্ভব,—জ্ঞান কল্পনারই নামান্তর। Locke-এর মতে সংবেদিত বস্তু হইতেই বুদ্ধির উৎপত্তি। তাহাই যদি হয় তবে সংবেদিত বস্তুতে এমন কিছু থাকিতে পারে না যাহা সংবেদনার অতিরিক্ত। কিন্তু সংবেদনার ফল বুদ্ধি হইল সর্বত্র চিত্তধৃত আভাস (impression); সুতরাং সংবেদিত বস্তু যে চিত্তাভাসের অতিরিক্ত আর কিছু তাহা বলা যায় না; অতএব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চিত্ত ও কল্পনা (idea) ব্যতীত আর কিছুই নাই। ইহাই হইল সংক্ষেপে Berkeley-র মত। কিন্তু Berkeley সংশয়বাদী ছিলেন না, সুতরাং ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকা ছিল তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। সেই জন্য তিনি আরও প্রচার করিলেন যে বস্তু অসৎ হইলেও তৎসম্বন্ধীয় চিত্তাভাস যখন সৎ তখন চিত্তাভাসের উৎপাদক হইল বস্তুজগৎ হইতে পৃথক্ অপর কোন শক্তি। Berkeley-র মতে এই শক্তি ঈশ্বর। Berkeley-র এই কল্পনাবাদ Holbach-প্রমুখ অস্তিবাদীর (Materialist) মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। অস্তিবাদিগণ কিন্তু Locke-এর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়াই শেষে Berkeley এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা।

Berkeley যে এক অতি উচ্চাঙ্গের দর্শন প্রচার করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয়, কিন্তু এক দিক হইতে যে তাহা হেতুবিবর্জিত (dogmatic) তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ তাঁহার মতে বুদ্ধির সমুদয় বিষয়াবলী হইল কল্পনা যাহা চিত্তাভাসরূপে উপলব্ধ হয়, এবং সেই কল্পনা হইল ঈশ্বরদত্ত। অর্থাৎ চিত্তাভাসের হেতুস্বরূপ কল্পনার আর কারণান্বেষণ করা চলিবে না। ইংল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং Kant-এর অগ্রদূত Hume এই কল্পনারও কারণান্বেষণ করিতে গিয়া শেষে সংশয়বাদে (Scepticism) উপনীত হ'ন। Hume-এর সংশয়বাদ অবশ্য ভারতীয় বিজ্ঞানবাদের মত এতটা সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত ছিল না। কিন্তু তথাপি স্বীকার করিতেই হইবে যে প্রকৃতপক্ষে Hume-এই Kant-এর দর্শনের আরম্ভ। Berkeley দেখাইয়া গিয়াছিলেন যে, গৃহীত বিষয়ের (cognised object) অস্তিত্ব কেবল গ্রাহকের (cogniser) বুদ্ধিতেই (intelligence) সীমাবদ্ধ; বুদ্ধিনিরপেক্ষ বাস্তব অস্তিত্ব যে কোন বস্তুর আছে তাহা প্রমাণ করিবার উপায় নাই। Hume এখন দেখাইবার

চেষ্টা করিলেন বুদ্ধির দ্বারা কিরূপে চিত্তে বস্তু সম্বন্ধীয় বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বুদ্ধির যাহা গ্রাহ্য তাহা যদি কেবলমাত্র প্রতীতি (impression) ও কল্পনা (idea) ভিন্ন আর কিছু না হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে বিবিধ প্রতীতি ও কল্পনার সমন্বয় ব্যতিরেকে বস্তু সম্বন্ধীয় বুদ্ধি সম্ভবই হইতে পারে না। প্রতীতি ও কল্পনা হইল একই বুদ্ধির দুইটি দিক্; যাহা বাহ্যলব্ধ তাহাই হইল প্রতীতি, কিন্তু কল্পনা হইল বহির্গামী। এখন কোন বস্তু সম্বন্ধীয় কোন বুদ্ধিকেই একটি মাত্র প্রতীতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অবশ্য ইন্দ্রিয়-সংযোগ ও প্রতীত্যুৎপত্তির ব্যবধানকালে যে অস্পষ্ট অস্তিজ্ঞান (awareness) অনুভূত হয় তাহার প্রথমাবস্থাটিকে একাত্মক (undifferentiated) বলা যাইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত প্রতীতির উৎপত্তি হইলে বুদ্ধি আর একাত্মক থাকে না, প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধিতে নানা বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। চিত্ত যখন নিশ্চেষ্ট বা অবসন্ন থাকে তখনই কেবল দেখা যায় যে "সমগ্র" বস্তু সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট বুদ্ধি উৎপন্ন হইতেছে; কিন্তু জাগ্রত চিত্তে কোন বস্তু পর্যালোচনা করিবার উপক্রম করিলেই সেই বুদ্ধি শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এবং তখন পর্যায়ক্রমে বস্তুর বিবিধ "গুণ" ভিন্ন আর কিছুই অনুভূত হয় না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে বস্তুর জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে বিবিধ বিশ্লেষজ্ঞানের (analytical judgment) সমন্বয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। অর্থাৎ, বিবিধ প্রত্যয় পরস্পর সংযোজিত করিলেই যেখানে পূর্ণ জ্ঞানটি লাভ করা যায় তাহাই হইল বিশ্লেষজ্ঞান। এখানে বিবিধ প্রত্যয় সংযোজিত করা ভিন্ন বুদ্ধির আর কোন প্রক্রিয়ার অবকাশই নাই, সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে বিশ্লেষজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক নহে। দর্শনের ক্ষেত্রে Hume-এর দান আরও অনেক; কিন্তু কাণ্টীয় স্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষজ্ঞান বুঝিবার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট।

Hume-এর মতে মানুষের পক্ষে জগৎ সম্বন্ধে কেবলমাত্র প্রত্যয়ই সম্ভব। Kant বলিলেন জগৎ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানও মানুষ লাভ করিতে পারে। ইহাই হইল কাণ্টীয় দর্শনের মর্মকথা। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান কাহাকে বলে? এই প্রশ্নেরই উত্তরে Kant বলিয়াছিলেন "স্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষজ্ঞান"। প্রকৃত জ্ঞান যে স্বতঃসিদ্ধ (a priori) হইবেই তাহার কারণ কি? কারণ যাহাই পরতঃসিদ্ধ (a posteriori), অর্থাৎ যাহারই অস্তিত্ব অপর কিছুর অস্তিত্বের উপর আংশিক ভাবেও নির্ভর করিতেছে, তাহা যে আংশিক ভাবেও সত্যই সৎ (real) তাহা বলিবার উপায় নাই। কোন সত্তা যদি অপর কোন সত্তার উপর নির্ভর

করে, এবং সকল সত্তাই এক পর্যায়ের হয়, তবে সেই অপর সত্তারও হেতুস্বরূপ আবার একটি সত্তা, এবং এইরূপে সত্তাপরম্পরার অনন্ত কাল ধরিয়া অন্বেষণ করিয়া চলিলেও প্রথম সত্তাটির সম্যক্ প্রমাণ কোন কালেই পাওয়া যাইবে না (infinite regress !)। সুতরাং সংশ্লেষজ্ঞান যদি স্বতঃসিদ্ধ না হয় তবে তাহার সত্তাই প্রমাণিত হইবে না।

কিন্তু সংশ্লেষজ্ঞান কাহাকে বলে, এবং Kant ইহাই প্রকৃত জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিলেন কেন? Kant বলিলেন জ্ঞান সংশ্লেষাত্মক বা বিশ্লেষাত্মক, এই দুই প্রকারের হইতে পারে; যে-জ্ঞান বিশ্লেষণ করিলে প্রত্যয়াবলী ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না তাহাই হইল বিশ্লেষজ্ঞান (analytical); কিন্তু যে-জ্ঞান বিশ্লেষণ করিলে সমন্বিত প্রত্যয়াবলীর অতিরিক্ত কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহাই হইল সংশ্লেষজ্ঞান (synthetic), এবং ঐ অতিরিক্ত অংশটুকু হইতেই প্রমাণিত হয় যে জগৎ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। কিন্তু সংশ্লেষজ্ঞান হইতে বাস্তবিকই প্রত্যয়ের অতিরিক্ত জ্ঞানও জন্মিয়া থাকে—কেবল একথা বলিলে প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানোৎপত্তির সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না; তজ্জন্য আরও প্রমাণ করিতে হইবে যে সংশ্লেষজ্ঞান বাস্তবিকই চিত্তে উৎপন্ন হয়। সুতরাং Kant ইহার পরেই প্রশ্ন তুলিলেন, স্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষজ্ঞান বাস্তবিকই মনুষ্যের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় কি? Kant প্রথমেই দেখাইয়া দিলেন যে অধীক্ষার (logic) দ্বারা এই প্রশ্নের কোন সমাধান হইতে পারে না, কারণ অধীক্ষার স্বভাবই এরূপ যে তদ্দ্বারা কেবল বিশ্লেষজ্ঞানই বিহিত হইয়া থাকে। এখন প্রকৃত জ্ঞানের যাহা বিষয় তাহা ইন্দ্রিয়লভ্য অথবা ইন্দ্রিয়াতীত। এই ইন্দ্রিয়লভ্য গ্রাহ্য বিষয়গুলির কিয়দংশ আমাদের স্বকল্পিত—যেমন সংখ্যা ও জ্যামিতির ত্রিভুজাদি। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ হইল বাহ্যলব্ধ প্রতীতি যাহা বুদ্ধির দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে; এইগুলিই হইল পদার্থবিদ্যার বিষয়। এবং যাহা প্রত্যক্ষ প্রত্যয়ের অতীত তাহারই আলোচনার ক্ষেত্র হইল পরাবিদ্যা (metaphysics)। সুতরাং সংশ্লেষজ্ঞান প্রকৃতই সম্ভব কি না তাহা দেখাইতে হইলে গণিত, পদার্থবিদ্যা ও পরাবিদ্যা এই তিনটিরই সম্যক্ পরীক্ষা আবশ্যক। Kant এইখানে একটি অতি গুরুতর কথা বলিয়াছেন যাহা আমরা সকল সময়ে মনে রাখি না। তিনি বলিয়াছেন গণিত, পদার্থবিদ্যা ও পরাবিদ্যায় স্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষজ্ঞান সম্ভব বলিয়া প্রমাণিত হইলেই যে সেই জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান তাহা বলা যাইবে না; তদ্দ্বারা এইটুকু মাত্র প্রমাণিত হইবে যে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব। এখন দেখা যাউক,

এই শাস্ত্রত্রয়ে বাস্তবিকই স্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষজ্ঞানের সন্ধান মিলে কি না।

জ্যামিতির একটি প্রসিদ্ধ সূত্রে কথিত হইয়াছে যে একটি বিন্দু হইতে আর একটি বিন্দুর স্বল্পতম দূরত্ব হইল সরল রেখা। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে "সরল রেখা" ও "স্বল্পতম দূরত্ব" পরস্পর অব্যভিচারী; সুতরাং সরল রেখার স্বল্পতম দূরত্ব স্বতঃসিদ্ধ। অথচ সরল রেখার প্রতি স্বল্পতম দূরত্বের আরোপ হইল একটি মানসিক প্রক্রিয়া; কারণ পরস্পর অব্যভিচারী হইলেও সরল রেখা ও স্বল্পতম দূরত্ব পরস্পরের সংজ্ঞালক্ষ নহে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যে-ভাবে বীজাণু পরীক্ষিত হইয়া থাকে সেই ভাবেই কোন সরল রেখা পর্যবেক্ষণ করিলেও তাহাতে স্বল্পতম দূরত্বের কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে না। সুতরাং এখানে যে একটি নূতন জ্ঞানের সৃষ্টি হইতেছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এখন দেখিতে হইবে এই নূতন জ্ঞানটি সংশ্লেষাত্মক কি না। এই জ্ঞান যদি বিশ্লেষাত্মক হয় তবে আলোচ্যমান বাক্যটির (Proposition) বিশেয্য (: সরল রেখা) ও বিশেষণ (: স্বল্পতম দূরত্ব) পরস্পর বিশ্লিষ্টভাবে কল্পনা করাও সম্ভব হইবে। কিন্তু সরল রেখা যে স্বল্পতম দূরত্ব হইতে বিশ্লিষ্টভাবে কল্পনা করা যায় না তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং সরল রেখার স্বল্পতম দূরত্ব বিষয়ক জ্ঞান বিশ্লেষজ্ঞান নহে। অতএব তাহা সংশ্লেষজ্ঞান, কারণ তৃতীয় অপর কোন প্রকারের জ্ঞান সম্ভবই নহে। ত্রিভুজের তিনটি কোণ দুই সমকোণের সমান—ইত্যাদি জ্যামিতির অন্যান্য সূত্রও কাণ্টীয় স্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষজ্ঞানের নিদর্শন। দুই ও দুইয়ের যোগফল যে চার হইবে ইহাও স্বতঃসিদ্ধ, কারণ যোগের ফল যে কেবল অপর কিছুর উপরে নির্ভর করিতেছে না তাহাই নহে, অপর কিছুর উপর নির্ভর করিয়া যোগ করিবার চেষ্টা করিলে ভুল হইবে। এখন বিবেচ্য, দুই আর দুইয়ে চার—এই জ্ঞানটি বিশ্লেষাত্মক না সংশ্লেষাত্মক। ইহা যদি বিশ্লেষজ্ঞান হইত তবে যোগফলটি দেখিয়াই বুঝা যাইত যে ইহা দুই ও দুইয়ের সমন্বয়ে উৎপন্ন। কিন্তু তাহা বুঝা যায় না, কারণ এক ও তিনের সমষ্টিও হইল চার। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে দুই ও দুইয়ে চার হয়—এই প্রকারের জ্ঞান হইল সংশ্লেষজ্ঞান।

পদার্থবিদ্যাতেও স্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষজ্ঞান সুপরিস্ফুট। পদার্থবিদ্যার মূল সূত্র হইল এই যে নৈসর্গিক জগতে যত কার্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহার কারণ প্রকৃতির মধ্যেই আছে; অর্থাৎ জগতের কোন বস্তুকেই বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করিবার উপায় নাই, প্রত্যেক কার্যবস্তুই পূর্বগামী পৃথক্ একটি কারণবস্তুর

মুখাপেক্ষী, কারণবস্তু ব্যতিরেকে কোন কার্যবস্তুই সম্ভব হয় না, এবং কারণবস্তু উপস্থিত থাকিলে কার্যবস্তু উৎপন্ন হইতে বাধ্য। এই সমস্তই হইল পদার্থবিদ্যার স্বতঃসিদ্ধ; কোন পদার্থতত্ত্ববিদ্ মনেও করেন না যে তাঁহার এই মূল সূত্রগুলির কোনটি তাঁহাকে অভিজ্ঞতা হইতে "প্রমাণ" করিতে হইবে, এবং এ-কথাও তিনি বলিতে পারেন না যে তাঁহার এই প্রকারের জ্ঞান হইল অভিজ্ঞতালব্ধ; কারণ জগতের সমস্ত পদার্থতত্ত্ববিদ্ একত্র হইয়া অনন্ত কাল ধরিয়া গবেষণা করিলেও কোন দিন একথা বলা যাইবে না যে জগতের যত প্রকার কার্য তাহার সমস্তই যে কারণসম্ভূত তাহা গবেষণার ফলেই প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সকল প্রকারের কার্য পর্যবেক্ষণ না করিয়াই পদার্থতত্ত্ববিদ্ বলিয়া থাকেন "কার্য কারণসম্ভূত," এবং এমন কোন সংশয়বাদী এখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই যিনি পদার্থতত্ত্বের এই সূত্রটি অস্বীকার করিতে পারেন। অবশ্য যাহা সাধারণতঃ কারণ বলিয়া মনে করা হয় তাহা হয়তো কোথাও প্রকৃত কারণ নহে; কিন্তু তথাপি প্রত্যেক কার্যের কারণ স্বীকার করিতে হইবে, এবং মায়াও সেই কারণ হইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে যে পদার্থতত্ত্বের কার্যকারণ সম্বন্ধ বিষয়ক বুদ্ধি হইল স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান। এবং এই জ্ঞান যে সংশ্লেষজ্ঞান তাহাও স্বীকার করিতে হইবে, কারণ এখানে বিশেষভাবে আরও বলা হইতেছে যে "দুইটি" পৃথক্ কার্য পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট: বিচার্য বিষয় অন্ততঃ দুইটি না হইলে পৃথক্ কার্যবস্তু ও কারণবস্তুর প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইতে পারে না। সুতরাং প্রমাণিত হইল, পদার্থবিদ্যার সর্বসম্মত বাক্য "কার্য কারণসম্ভূত" স্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষজ্ঞানের একটি নিদর্শন।

সর্বশেষে পরীক্ষা করিতে হইবে, পরাবিদ্যার (metaphysics) ক্ষেত্রেও স্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষজ্ঞান সম্ভব কি না। পরাবিদ্যা হইল সেই শাস্ত্র যাহাতে ইন্দ্রিয়োত্তর (suprasensuous) বস্তু ও স্বলক্ষণ বস্তুর (Ding an sich) সম্বন্ধে বিচার ও সিদ্ধান্ত করা হয়। কেবলমাত্র বুদ্ধির ভিত্তিতেই পরাবিদ্যায় আত্মার সত্ত্ব (substance), সর্গতত্ত্ব (cosmogony), ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও গুণাবলীর বিচার করা হইয়া থাকে। এই সকল বস্তু হইল সম্পূর্ণরূপে সংবেদনের অতীত; বুদ্ধির দ্বারা এগুলি কেবল মনন করা যায়, গ্রহণ করা যায় না। তথাপি পরাবিদ্যায় এগুলির পূর্ণসত্তা স্বীকৃত হইয়া থাকে। এখানে বিবেচ্য, আত্মাদির ন্যায় মননসর্বস্ব বস্তু কেবলমাত্র কল্পনা, অস্তিত্বশীল বস্তু নহে। মননসর্বস্ব বস্তু ও অস্তিত্বশীল বস্তু সম্পূর্ণ পৃথক্ স্তরের; আমি নিজেকে কি মনে করি এবং আমি বাস্তবিক নিজে কি—

এই দুইটি প্রশ্নের একই উত্তর দেওয়া কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নহে। এখন আত্মার ন্যায় সম্পূর্ণ মননসর্বস্ব বস্তু (যাহা প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বশীল নহে) সম্বন্ধে যখন বলা হয় "আত্মা অস্তি" তখনই কিন্তু বিশেয়টিকে (: subject, আত্মা) এমন একটি বিশেষণের (: predicate, অস্তি) সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া ফেলা হয় যাহা আদৌ আত্মার সংজ্ঞালব্ধ গুণ নহে। ইহাই কিন্তু সংশ্লেষজ্ঞানের লক্ষণ। এ-কথা পদার্থবিদ্যার দুইটি বাক্য তুলনা করিলে বুঝা যাইবে। "বস্তু বিস্তৃতিবিশিষ্ট" হইল একটি বিশ্লেষজ্ঞান, কারণ এখানে বিশেষণটি বস্তু সম্বন্ধে নূতন কোন জ্ঞানলাভে সাহায্য করে না। কিন্তু "বস্তু ভারবিশিষ্ট" হইল একটি সংশ্লেষজ্ঞান, কারণ ভারবিশিষ্টতা বস্তুর সংজ্ঞালব্ধ গুণ নহে অথচ তাহা বস্তুর সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে সংশ্লিষ্ট। পরাবিদ্যায় আত্মার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। এবং "বস্তু ভারবিশিষ্ট" যেমন একটি সংশ্লেষজ্ঞান "আত্মা অস্তি"ও তদ্রূপ। অস্তিবাচক সকল বাক্যই হইল সংশ্লেষজ্ঞাপক; কারণ "অস্তিত্ব"কে যতই বিশ্লেষণ করা যাউক না কেন তাহাতে কখনই "বিশেষ" কোন সত্তার সন্ধান পাওয়া যায় না; অথচ বিশেষ কোন সত্তার সহিত সংশ্লেষিত না হইলে "অস্তি" কথাটিরই কোন অর্থ হয় না। পরাবিদ্যার ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবার কোন কারণ নাই। সুতরাং পরাবিদ্যার অভিসম্মত "আত্মা অস্তি" প্রভৃতি বাক্য হইতেই পরাবিদ্যার ক্ষেত্রেও স্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষজ্ঞানের সত্তাব্যতা প্রমাণিত হইতেছে।

ইহাই হইল কাণ্টীয় স্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষজ্ঞান। ইহার দ্বারা Kant প্রমাণ করিয়াছেন যে গণিত, পদার্থবিদ্যা ও পরাবিদ্যা—এই তিন ক্ষেত্রেই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। Kant অবশ্যই কোথাও বলেন নাই যে গণিত ও পদার্থবিদ্যায় যে-জ্ঞানই লাভ করা যায় তাহাই তত্ত্বজ্ঞান। সেই জন্যই Kant-এর যুগের গণিত ও পদার্থবিদ্যা অধুনা পরিত্যক্ত হইলেও কাণ্টীয় দর্শন এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। Kant যাহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহা হইল প্রধানতঃ দর্শনপ্রস্থান, এবং অধ্যাপক কবীর (পৃঃ ৮৮-৮৯) যথার্থই বলিয়াছেন যে ব্যবহারবাদ ও ব্রহ্মবাদের সীমানির্দেশ এবং এতদুভয় স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল Kant-এর উদ্দেশ্য। আমার নিজের বিশ্বাস, কাণ্টীয় দর্শন যথোচিত প্রচারিত হইলে ইউরোপের আজ এই দুর্দশা হইত না। সাহিত্যে Dadaism, আর্টে Cubism, অর্থনীতির সাম্রাজ্যবাদে এবং রাষ্ট্রনীতির যুদ্ধবিগ্রহে পরিণতি—সবই মানুষের জ্ঞানবিমুখতার ফল, এবং জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব—এই প্রকারের একটা কুসংস্কার হইল আধুনিক যুগের এই জ্ঞানবিমুখতার কারণ। কাণ্টীয় দর্শনের চর্চা অক্ষুণ্ণ থাকিলে এই বিকৃত বুদ্ধি কখনই সম্ভব হইত না।

দিক্ (space) ও কাল (time) অমোঘ পদার্থ (category) রূপে স্বীকার করিয়াও তত্ত্বজ্ঞান ও তথ্যজ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনই হইল Kant-এর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এখন কিন্তু আর দিক ও কাল অমোঘ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা হয় না, কারণ এ-সম্বন্ধে ভারতের বিজ্ঞানবাদী দার্শনিকগণ যাহা বলিতেন তাহাই এখন বিজ্ঞানে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে—দিক্ ও কালের পরিবর্তে এখন আমরা বলি space-time-continuum। বৈজ্ঞানিক আজ বাস্তবিকই স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারেন, যে-ব্রহ্ম দার্শনিকগণ চিরদিনই অনির্বচনীয় বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন সেই ব্রহ্মেরও তাঁহারা সাক্ষাৎ পাইয়াছেন; জড় (matter) ও চেতনের (mind) সামঞ্জস্যই (synthesis) যদি ব্রহ্মের লক্ষণ হয় তবে বিদ্যুৎই (electricity) হইল ব্রহ্ম। কিন্তু কাণ্টীয় দার্শনিক উত্তরে বলিতে পারেন, যে-ব্রহ্মের আবির্ভাব সত্ত্বেও মানুষ বলিতে পারে না "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ" সে-ব্রহ্ম নকল ব্রহ্ম, আসল নহে। কাজেই ব্রহ্মের সন্ধান শুধু এখনই নয় চিরদিনই তোমায় করিতে হইবে, এবং সে-জন্য তোমার প্রধান অস্ত্র কাণ্টীয় স্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষজ্ঞান।

কুয়াশা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

মুহূর্তগুলো মরে-যাওয়া আর বেঁচে-ওঠার ইতিহাস গাঁথে,
অশ্রান্ত পটক্ষেপ চলে মনের
মেঘের রঙের মতো।
তার চেয়ে কতো বেশি কুয়াশা পাথরের স্তরের মতো রয়ে
গেছে নীচে!

আলোতে নয়
কুয়াশাতেই আমরা মানুষ,
এ-কুয়াশা সভ্যতার নীহারিকা।

কী হবে আলো আর আগুনে
প্রকৃতির নির্ব্বোধ উচ্ছ্বাস যারা
মৃত্যুহীন যাদের পুনরাবৃত্তি।
সন্ধান তারা দেয় না ত কোনো নূতনতর বর্ণের
বন্ধ্যা আলো আগুন মানুষের নয়:

পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে একদিন এসেছিল ভোর
আশ্চর্য্য পৃথিবী আর রাত্রিময় তন্দ্রাশীলা তার
হয়ত মেলেছে চোখ ঘুম-ভাঙা পাখীর মতন
এখনো ভোলেনি তারে আকাশের মেঘের পাথর।

দুরন্ত, তরুণ, দ্রব দাক্ষিণাত্যে বুঝি কোনোদিন
আগ্নেয়গিরির মুখে লাল হয়ে উঠেছে আকাশ
এখনো সন্ধ্যার মেঘ আছে দীর্ঘ দিগন্তের গায়
পশ্চিমঘাটের পারে সোনা হয় সমুদ্রের জল।

কিন্তু সেদিনের দুর্জ্ঞেয় মনের ইঙ্গিত
আজ কোথায় !
দুস্তর-দূর-নেমে-আসা বন্য কুমারীর চোখ,
তক্ষশীলার তরুণীর কণ্ঠে অরণ্যের প্রতিধ্বনি,
অস্পষ্ট, অদ্ভুত হয়ত রুক্ষ আর রহস্যময়
নেই আর।

পার হয়ে এসেছে তারা নূতন আকাশের দুরন্ত বৃষ্টি-ধারা
মেঘদূতের মেঘ—উর্বশী-পুরূরবার জ্যোৎস্না রাত্রি—
জহর আর কামানের ঝল্‌সানো আগুন তারপর
তলোয়ার, উল্কি আর সতীদাহ—
তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যার ঠাণ্ডা প্রদীপ শিখা
মন হতে মনে নেমে এলো।
এলো শেষে আমাদের কুমারীর মনে শাড়ির ঝলমল
টেলিফোনে তাদের ধাতব কণ্ঠ।
এরা—
আর যাদের স্বপ্নের রঙে ম্যাডাম কুরীর রেডিয়াম
স্বপ্নের পাখায় এরোপ্লেনের প্রপেলারের তুফান
সেই সোচ্চার মেয়েরাও বা
কতো নিশ্বাসের কুয়াশায় ভরা !

কেতকী রায়ের চোখে জল :
চুলে আর মোটরের চাকায় যে হাওয়া
শাড়িতে যে প্যারিসের বিকেল ছড়ায়
সেই হাওয়া চেনে সে কেবল।
দখিনসাগর দ্বীপ এলো বুঝি তবু
তার নীল নারিকেল-বনের হাওয়ারা
কেতকী মনে ছলছল।
সামোয়ান-কুমারীর ঝরণা শরীর,
উন্মিল উরু আর ভুরুর স্বপন
বন্ধুর করে সমতল।

ভালোবাসি কেতকীদের :
হয়ত তাদের চোখের ঠাণ্ডাকে, ঠোঁটের উত্তাপকে
শারীর রেখাময় শাড়িকেও হয়ত ভালোবাসি
তবু সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা আছে সে-কুয়াশার জন্যে
তাদের ঘিরে রাখে যে নির্মোক
অজ্ঞাত সম্ভাবনার জন্মভূমি।

কোনো প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা নেই এর :
ভালোবাসি যাদের তাদেরই কি আমরা চিনেছি
কতটুকু ভালোবাসাকেও বা !
তাইতো এতো আবেগ তার।
আবিষ্কার করতে পারিনি নিজকে
তাইতো এতো ভালো লাগে জীবন—
আর তাইতো জীবন অফুরন্ত ॥

প্রবাস

অরুণকুমার মিত্র

সমুদ্র-পৃষ্ঠের বেড় ছাড়ালাম নীচে দূর নীচে—
তুষারের মায়াবী সীমানা
শূন্যচর।
মেঘলোকে
কোন্ রাজ্য আবিষ্কার ?
শোচনীয় সমতল ভুলে যাওয়া যাবে।
ঘনপত্র সন্নিবেশে কতকাল থেকে
অভ্যর্থনা—
সমতল স্বপ্নহর এখানে বিস্মৃত।

পাহাড়ে ফসল ফলে !
পাথুরে মাটিতে থাকে থাকে
অবরোহী ক্ষেতের বিথার।

উত্তর সীমার শীতে ঘাম ঝরে গেছে
উদ্ভিদ লালনে।
তুহিনে ঝাঁঝালো রোদে চারাগাছে প্রাণের আবেগ,
(প্রাতরাশে অপূর্ব্ব নির্য্যাস) ;
বাগিচার তুলনা বিরল।
বসতি বিরল হ'ল আবাদের ক্ষিপ্র ইন্দ্রজালে।
এখানে শহর !
চেনা মানুষের ডেরা
দূরগত স্মৃতি-ঘেরা
জমাট শহর।
উদ্ভিন্ন পর্ব্বতচূড়া সন্তর্পণে রহস্য জমায় ;
তখনো হোটেলে বাল্‌ব্ জ্বলে।
পিচঢালা সর্পিল রাস্তায়
মোটরের হর্ন বাজে,
উপত্যকায় ঘোরে প্রতিধ্বনি···প্রতিধ্বনি ;
আর খাদে খাদে
আলো বিঁধে কুয়াশার
অতল শিহর
অন্ধকারে কখনো বা।
তারপর হোটেলে আরাম,
তারপর চেনা মুখ, প্রাসাদের ভিড়, পদভরে কম্পিত
মেদিনী।

পাহাড়ের সন্ততিরা শশব্যস্ত—
এক ফোঁটা জমি যদি পায়
বাসা বানাবার
এমন আকাঙ্ক্ষা যারা পোষে।
হিমগিরি ধ্যানাতুর।
যোজন যোজন জমি উর্ব্বর আবাদে গেছে ছেয়ে।

• • •

এখানে এবার নাই বরফের মোহ
চড়াই এলাকা খালি ;
বনগিরি মাঠ স্বপ্ন দেখাক্ সেধে—
সুদূর গৃহস্থালি।
পৃথিবী অসীম—ধাবমান ধূমকেতু
অধিত্যকায় হয় তো নিখোঁজ হবে,
পরম যত্নে বাঁধা শড়কের সেতু
পার হয়ে চলো, চলো কোনো দিকে উধাও।

দিকজয়ী পথ চারিধারে আছে পাতা,
নদীতীরে কাছাকাছি
বাঘের থাবার ছাপ লাগে অতি মৃদু—
অধীর সব্যসাচী।
শিকারীর দল। আর কারা রাস্তায় ?
রেঙ্গুনে চায় ছ'মাহিনা ভোর কাজ
খনি খামারের দেশ কি দেয় বিদায় ?
শিকার—শিকার—বনভূমি পদ দলন।

এই পথ গেলো পাহাড়ের পিঠ বেয়ে—
অধো তরঙ্গে নেশা—
তারপর ঘুম চল্‌তি পথেই ছোটে,
আঁখি-বিস্ফারে মেশা
দুর্লভ জ্ঞান। এখন লড়াই চলে
রাজায় রাজায় ; জঙ্গী আমেজে ভারি
অরণ্যপথ, নিভৃত কৌশলে
ইমারৎ ওঠে—ব্যারাক বন্দিশিবির।

সপ্তপদী

মণীন্দ্র রায়

(টবের ফুল)

তাম্রসন্ধ্যা নয়নে তোমার উত্তাপ কোথা পাই ?
পরিচর্য্যা ও আদরে যদিও হয় না-ক' মোটে ভুল !
বন্দী মাটিতে গুটানো শিকড়, জীবনের সাড়া নাই।
তেতালার ঘরে ছায়া দিল শুধু চিন্তার কালো ঝুল।
আমার এ গানে হৃদয়ে তোমার জোয়ার এলনা তাই !···
আবেগনিথর কপালে জমেছে শিথিল বেণীর চুল
মুখোমুখী চাওয়া তুমি আর আমি,—শীর্ণ টবের ফুল !

(টাওআর ক্লক্)

আমারি নিয়মে সূর্য্যের বাঁধা দ্রাঘিমা-পর্য্যটন।
ইস্পাত হাতে ক্ষমাহীন আমি সময়ের জট খুলি।
ছুটি ক্ষ'য়ে যাওয়া সৈন্যের যদি কাঁদে তো কাঁদুক মন,
কেরানীর বউ থাকুক গলিতে ব্যস্ত নয়ন তুলি',—
আমি দৃঢ়, করি কাংস্যকণ্ঠে সত্য-উদ্‌ঘাটন !...
সবই ছিল ঠিক, হঠাৎ বাজারে এল হাতঘড়িগুলি,—
ভাঙা ফটকের দেয়ালে এখন বুর্জোআ হয়ে ঝুলি !

তথাপিও

আবুল হোসেন

শুনেছি তোমার কথা সব :
জানি জানি আমাদের দিনগুলি ক্ষীণায়ু স্থবির,
বাজে কাগজের ম্লান রাত
কুটি কুটি ছিঁড়ে যদি ফেলে দিতে চাও দিতে পারো,
(আমি তুলিব না হাত)
সহস্র বসন্ত শেষে যদি তুমি দেখে থাকো আজ
সময় বিনিদ্র আঁখি কাটায় প্রহর
বসন্তের বীজাণু আচ্ছন্ন
তবু আমি করিব না চুপ,
তবু আমি মানিব না কভু পরাজয়।

ফুলে ও মালায় মোরা জীবনেরে দেই নি গৌরব,
গাহি নাই জয়স্তুতি গান ;
নহিত মরণজয়ী কেহ ;
তবু কেন আজি এই মৃত্যুর উল্লাস ?
কাপুরুষ, কাপুরুষ যত।

আমাদের ক্লেদাক্ত জীবন,
ঘৃণ উই মুষিকের আবির্ভাবে ভয়ে জড় সড়
সচকিত সঙ্কুচিত,
বার বার খুঁজিয়াছে নির্ভিক মার্জ্জার ;
স্বপ্ন সে দেখেছে প্রতিদিন
কালের পর্দ্দায় ঢাকা অমর আত্মার।

সহস্র ভাটার শেষে আসিবে জোয়ার সুনিশ্চিত,
প্রবল বন্যায়
ভেসে যাবে ইমারত, পাষাণ প্রাসাদ
ভেঙে চুরে গুড়ো হ'য়ে পড়িবে কঙ্কাল
পথের ধূলায়
আগামী চেঙ্গীস নয় নাদিরের বজ্র অভিযানে।

আমাদের শক হুন ইরাণী তাতারী উষ্ণ রক্তে
লাগিয়াছে সুমেরু তুহিন
ঘুমায়ে সমুদ্রগর্ভে কত না জাহাজ
আর কত বাঁধা আছে বালুর চড়ায়
ঘুম ঘুম ঘুম
ঘুমায়েছে ব্যাবিলন, পিরামিডগুলি,
প্রাচীন মিশর,
সহস্র মহঞ্জোদাড়ো,
সুলেমান, রিচার্ড, ক্রুসেড,
জেরুজালেম।
ঘুম ঘুম ঘুম

তবু তো আজিও স্বপ্ন দেখি
তবু তো হৃদয় করে আজো টন্‌টন্‌
তবু তো শোণিতে জাগে অনিরুদ্ধ দুর্ব্বার প্লাবন
তবুও তবুও

মাটি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দরজার কাছে কে-একটা লোক ঘুরঘুর করছিলো। হেডমাষ্টারবাবু খেঁকিয়ে উঠলেন: 'কী চাই?'

লোকটা থতমত খেয়ে সরে যাচ্ছিলো, হেডমাষ্টারবাবু তাকিয়ে দেখলেন, সামনেই তাঁর ইস্কুলের ছেলে আজিজর রহমান। বললেন, 'দেখ তো লোকটা কে।'

এ সময়টা হেডমাষ্টারবাবুর ভয়ের সময়। তিনবছর আগে নরোত্তমপুরে থাকতে তাঁর বাড়ি পুড়ে যায়, ঝাঁকে-ঝাঁকে বেনামী চিঠি তাঁর হাতে আসে। এ জায়গাটা ঠিক পাড়াগাঁ না হলেও বলা যায় না কার কী অভিসন্ধি। দিনে-দুপুরে হলেও গা-টা ছমছম করে ওটা আশ্চর্য নয়।

'আমার ফাদার স্যার।' আজিজ কুণ্ঠিতমুখে বললে।

এতটা গুরুদয়ালবাবু ভাবতে পারতেন না। যেন থমকে গেলেন।

ছেলের পরিচয়ের সুতো ধরে সাহসে ভর করে আমানত ঘরে ঢুকলো। গুরুদয়ালবাবু যেন ফাঁপরে পড়লেন, আর কোনো কারণে নয়, ছেলের সঙ্গে বাপকে কিছুতেই মেলাতে পাচ্ছেন না বলে। আজিজের পরনে ঢিলে পা-জামা, পায়ে স্যাণ্ডেল, গায়ে ডোরা-কাটা সার্টের উপর গরম কোট, বুকটা বিস্ফারিত খোলা, সার্টের কলারটা ইস্ত্রির কড়া শাসনে ফণা তুলে আছে। আর, আমানত প্রায় বুড়ো, পরনে খাটো পুরানো লুঙ্গি, গায়ে ছিটের কোরা কুর্তা, কাঁধের উপর জ্যালজেলে একখানা দোলাই।

কেন এসেছে, গুরুদয়ালবাবুর আন্দাজ করতে দেরি হলো না। তবু, অভিভাবক যখন, বসতে দিতে হয়।

'বসুন।'

ফাঁকা চেয়ার ছিলো সামনে কিন্তু আমানত দরজার কাছে মেঝের উপরই বসে পড়লো। হাত জোড় করে বললে, 'ঐ আমার একমাত্র ছেলে। বাবু, আপনি না দয়া করলে—'

ছেলেকে কোথাও দেখা গেল না। বাপকে পৌঁছে দিয়েই সে গা-ঢাকা দিয়েছে।

গুরুদয়ালবাবু বিরক্তমুখে বললেন, 'আমরা দু' সাবজেক্ট পর্যন্ত কনসিডার করেছি কিন্তু আপনার ছেলে তিন সাবজেক্টে ফেল।'

'চাষাভুষো মানুষ, অতশত বুঝি না বাবু। শুধু কৃপা করে ছেলেটাকে আমার—'

'কৃপা করে—' গুরুদয়ালবাবু হাসলেন : 'তা হলে ইস্কুলের বেঞ্চি-চেয়ার-গুলোই বা কী দোষ করেছিলো ? আপনার ছেলেকে এলাউ করতে হলে বেঞ্চি-চেয়ারগুলোকেও এলাউ করতে হয়।'

'ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই বাবু।'

এই যুক্তির সামনে গুরুদয়ালবাবু ভারি অসহায় বোধ করলেন। বাইরে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়।

আমানত তাঁর পিছু নিলো। আগের কথাটার পুনরুক্তি করলো। লিখিত পুনরুক্তিটা বিরক্তিকর, কিন্তু কথিত পুনরুক্তিটা কেমন কাতর শোনায়।

'কী করেন আপনি ?'

'আমি ? গৃহস্থি করি।'

'গৃহস্থি মানে ? চাষবাস ?'

'তা নইলে খাবো কি করে বাবু ?'

'প্রজাবিলি আছে ? না, খাসে রেখে আধি দিয়েছেন ?'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে রেখে আমানত বললে, 'জমিই মোটে এখন দশ বিঘেতে দাঁড়িয়েছে। তার আবার প্রজাবিলি না আধি।'

'জমি তবে নিজেই চাষ করেন নাকি ?'

'আর কে করবে বলুন। দু' চারটে পাইট কখনো খাটে, মাঝে-মাঝে দু'চার বিঘে কখনো ফুরণ দিই, নইলে সব আমিই নিজ হাতে কারকিত করি।'

চলতে-চলতে গুরুদয়ালবাবু থেমে পড়লেন। কম করে গ্রাম্য একজন গাঁতিদার বা মহাজন ভেবেছিলেম, কিন্তু একেবারে নিজের হাতে লাঙল ঠেলে—এটা যেন তাঁকে ঘা মারলো। আপাদমস্তক দেখলেন একবার আমানতকে। দেখে তাঁর আর সন্দেহ রইলো না, এ একেবারে একজন খাঁটি মাটির মানুষ।

গুরুদয়ালবাবুর গলা থেকে সম্ভ্রমের সুরটুকু উবে গেল। বললেন, 'তোমার তবে এই ঘোড়ারোগ হলো কেন ?'

আমানত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

'বলি, ছেলেকে দিয়ে এই ঘোড়দৌড় খেলার সখ হলো কেন তোমার ? হাল ছাড়িয়ে কলম ধরতে দেবার কী দরকার ছিলো ?'

আভাসে মর্মার্থটা বুঝতে পেরেছে আমানত। ম্লান চোখে ঔজ্জ্বল্য আনবার চেষ্টা করে বললে, 'ও যে বড়ো হতে চায় বাবু।'

'যথেষ্ট বড়ো হয়েছে !' গুরুদয়ালবাবুর গলায় একটু শ্লেষ ফুটে উঠলো কিনা আমানত ধরতে পারলো না : 'চাষার ছেলে ক্লাশ টেন পর্যন্ত পড়েছে এতেই গাঁয়ে পণ্ডিতি মিলে যাবে দেখো। নিদেন রেজেষ্ট্রি-আপিসের ডিড-রাইটার তো হতে পারবে।'

'না বাবু, অত ছোটতে ও রাজি নয়।' আবার চকচক করে উঠলো আমানতের চোখ : 'ও বলে ও হাকিম হবে, মেম্বর হবে, মন্ত্রী হবে—'

'কিন্তু অত যে হবে, পড়ে না কেন ?'

'পড়বে বাবু, ঠিক পড়বে। আপনি খালি এ-যাত্রা ওকে পাশ করিয়ে দিন। আমি ওর জন্য আলগা মাষ্টার রেখে দেব।'

'তোমার যে দেখছি অনেক পয়সা।' গুরুদয়ালবাবু বাঁ চোখের কোণটা একটু কুঞ্চিত করলেন : 'মহাজনি আছে বুঝি ?'

'হায়রে বরাত !' আমানতের মাথাটা ঝুঁকে পড়লো মাটির দিকে, হতাশার ভঙ্গিতে।

'তবে, দশ বিঘে তো জমি, চালাও কি করে ? জমা কত ? খানেওলা ক'জন ?'

'দশ বিঘে তো হালে বাবু, কিন্তু ছিলো আমার সত্তর বিঘে। তিন মৌজায় ছড়ানো। বেশির ভাগই তার কান্দর জমি, বিঘে প্রতি ধান হতো দশ-বারো মণ। খলেনে যখন ধান এনে তুলতাম—' আমানতের গলা ঝাপসা হয়ে এলো।

'সে সব গেল কোথায় ?'

'সব এই ছেলের পিছনে। খাইখালাসী বন্ধক নিয়েছে মহাজন, খতে লিখেছে জায়সুদি। শেষকালে আসল টাকার জন্য ডিক্রি জারি করে নিলেম করে নিয়েছে। হাওনোটে টিপ দিয়েছি দশ টাকা বলে, পরে শুনি আর্জি করেছে একশো টাকায়। দশের পিঠে একটা গোল্লা বসালেই নাকি একশো হয়। লেখাপড়া জানি না বলেই তো এই দশা। তাই মতলোব ছিলো ছেলে আমার লেখাপড়া শিখে মানুষ হলে দলিলে-দস্তাবেজে আর কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না। জমি-জিরাৎ সব সামলাতে পারবে।'

'দলিল পড়তে আর লাগে কী! ঢের হয়েছে তোমার ছেলের বিদ্যে।'

'আমিও তাই ওকে বলি বাবু, ঢের হয়েছে। কী হবে আর বিদ্যে নিয়ে? তুই চলে আয় আজিজ, বলি ওকে, বাপে-পোয়ে মিলে জমিতে লেগে যাই দু'জন। গোলা ভরে সোনা জমাই। আবার আমার সত্তর বিঘে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি।' আমানতের দুই চোখ আবার চকচক করে উঠলো।

'ও কী বলে?'

'রাজি হয় না বাবু।'

'তা কী করে হবে? গায়ে যে তিন পল্লা উঠেছে। গেঞ্জির উপর সার্ট, সার্টের উপরে কোট। বড়ো যে প্যাঁচ লাগিয়ে দিয়েছ। অত সব ছাড়ে কি করে?' গুরুদয়ালবাবু হাসলেন।

আমানত এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। বললে, 'তাই আর ওর পাশ করা ছাড়া গতি নেই। দয়া করে দিন না ওকে বেরিয়ে যেতে।'

'এখন আর আমার হাতে নেই। তলার দিকটা সেক্রেটারিবাবুর হাতে। তাঁর সঙ্গে দেখা করো গে। কী উঠেছে এবার তোমার ক্ষেতে?' ছোট্ট ভ্রূকুটি করে গুরুদয়ালবাবু কেটে পড়লেন।

পালানে কিছু ঠাকুরি-কলাই করেছিলো আমানত। ঝুড়ি করে তাই নিয়ে দেখা করতে গেল সে সেক্রেটারিবাবুর বাড়ি।

ভুজঙ্গ হালদার শুধু ইস্কুলের সেক্রেটারি নয়, যৌথ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, তদুপরি অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। বিকল্পে সবাই তাঁকে অনাহারী বলে। সেই কারণে সর্বত্রই তাঁর গ্রাসটা কিছু উদ্যত।

ফেরিওয়ালা ভেবে আমানতকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন ভুজঙ্গবাবু, কিন্তু তার বক্তব্য শুনে ও ঝুড়িটার ওজন আন্দাজ করে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলেন। বললেন, 'শেষ লিষ্টি আমি কাল সকালেই টাঙিয়ে দেব। দেখি আর কে-কে আসে।'

শহর থেকে আমানতের বাড়ি প্রায় তিন ক্রোশ, দু'দুটো খাঁড়ি পেরিয়ে, মরালডাঙার গাঁয়ে। আজিজ থাকে ইস্কুলের হস্টেলে, সানকিতে করে পান্তা আর পেঁয়াজ খেয়ে নিত্যি সে পায়ে হেঁটে ইস্কুল করতে পারে না। আর তার সবে-ধন এই আজিজ। দু'দুটো জোয়ান ছেলে মরেছে জ্বরে কাঁপতে-কাঁপতে, রেখে গেছে কতগুলি মেয়ে, চাষার ঘরে যা অবান্তর। ছেলের জন্যে বুড়ো বয়সে সেও নিকে করেছিলো কিন্তু নেকজানের মা কেবল রোগে ভোগে।

সকাল থেকে আমানতের মন খারাপ। আজিজ সব শুষে নিচ্ছে এই বলে নেকজানের মা তাকে সমস্ত রাত গঞ্জনা দিয়েছে। কোথায় ছিল আর কোথায় তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে আজিজ। আমানত বলেছে: 'আর দুটো দিন সবুর করো নেকজানের মা, আজিজ আমাদের আবার সব ফিরিয়ে দেবে।' নেকজানের মা বলেছে: 'কচু! মান সেদ্ধ খেয়ে থাকতে হবে সবাইকে।'

নেকজানের মার আমলেও সে কম দেখেনি। আগে দলিজঘর ছিল, খলট ছিল যেন বেড়াবার মাঠ, দু'খানা ছিল গরুর গাড়ি, সাইকেল ছিল একটা, তিন-তিনটে ছিল হ্যারিকেন। তার গায়েও দু'চার গাছা বাজু-খাড়ু উঠেছে। কিন্তু আজ সে সব কোথায়? ঘরের টিন উড়ে গিয়ে ছন এসেছে, অস্থাবর করে গাড়ি-গরু-সাইকেল ধরে নিয়ে গেছে মহাজন, খলটের জমি লেগেছে এখন খেতির কাজে। গাছ-গাছালিতে বাড়ির সীমানা ছোট হয়ে আসছে দিন-দিন।

কিন্তু আশা ছাড়েনি আমানত। বাড়ির গায়ে হালটের উপর দাঁড়িয়ে আদিগন্ত তাকিয়ে এখনো সে আন্দাজ করতে পারে কতদূর পর্যন্ত তার জমির সাবেক চৌহদ্দিটা প্রসারিত ছিল। তার ঠাকুর্দা এজারদ্দি সেখ—মুদাফৎ এজারদ্দি সেখ আজো দেখা যাবে জমিদারের চিঠা-খতিয়ানে। ভয় নেই, সব আবার আজিজ ফিরিয়ে আনবে। বিয়ে করে ছেলে এনে দেবে তাকে এক পাল—নাতিতে-ঠাকুর্দাতে মিলে তারা চৌপহর আবাদ করবে। আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামবে ঝমঝম। মাঠে জল দাঁড়িয়ে যাবে একহাঁটু। মাঠ ছেয়ে তরতাজা ধান উঠবে গজিয়ে।

ভাটিবেলায় আজিজ এসে হাজির।

'নাম টাঙিয়ে দিয়েছে বাপ জান। এক লক্ষণ মণ্ডলের ছেলেটা পায়নি। লক্ষণ বিনাটাকায় হাণ্ডনোট কাটতে রাজি হয়নি, তাই।'

আমানতের খুসি হবারই কথা, কিন্তু কেন কে জানে চোখদুটো তার চকচক করে উঠলো না। ছেলেকে কেমন যেন তার বিদেশী, বেমানান মনে হচ্ছে। যেন বড়ো বেশি এলেম, বড়ো বেশি চটক তার চেহারায়। সব কিছু কেমন বেজুত লাগে তার সামনাসামনি।

'পাশ করলে, এক হাঁড়ি রসোগোল্লা নিয়ে আসতে পারলে না?' নেকজানের মা মুখ ঘুরালো।

আমানতের মনে পড়লো এমনি রসগোল্লা আনতো সে সহর থেকে যখন ভালো দর পেত সে ধানের। বলতো: 'খবর জবর ভালো নেকুর মা, সরু-

এলাইর দাম চড়েছে। কিনে এনেছি এই রসোগোল্লা। আর এই এক গোছা পদ্মপাতা। সবাইকে দাও পাতায় করে।'

সে সব দিন কি আর আছে ?

'চাচা এই তিলকুট দিয়েছে নানী। গুড়ের তিলকুট।'

'গুড়ের নয় বোকা।' আজিজ সংশোধন করে : ওটা চকোলেট। সাহেবমেমের বাচ্চারা খায়।'

তিলকুটের স্বাদ বেড়ে যায়। তারপর তার মোড়কের কাগজ নিয়ে শিশুগুলোর মধ্যে মারামারি সুরু হয়।

'এলাউ তো হলাম, কিন্তু ফি-ঠি জড়িয়ে লাগবে এখন প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা।' আজিজ আমানতকে মনে করিয়ে দেয়।

'টাকা ?' আমানত যেন ভিতর থেকে ঝাঁকুনি খায় : 'এত টাকা মিলবে কোথায় ?'

'না মিললে চলবে ক করে ? শেষকালে পারে এসে ভরাডুবি হবে নাকি ?'

হলেও যেন ভালো ছিল। আমানতের বুকের ভিতরটা হাজাশুখা জমির মত খাঁ-খাঁ করতে থাকে।

'এবার ছাড়ানি দে, আজিজ। ঐ ছাখ ঐ নদী পর্যন্ত আমার জমির সীমানা ছিলো।' দক্ষিণে দূর জলের রেখা যেখানে আকাশের সাদায় গিয়ে মিশেছে সেই দিকে চেয়ে আমানতের চোখ চকচক করে ওঠে : 'সব হাতছাড়া হয়ে গেছে। আয়, দুজনে লেগে যাই লাঙল নিয়ে, সব আবার ছিনিয়ে নিয়ে আসি বুকে করে।'

আজিজ হেসে ওঠে : 'তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি ? নিশ্চয় সব আবার ছাড়িয়ে নিয়ে আসবো। আমাকে মানুষ হতে দাও একবার। তুমি ভাবছ কী ? থাকবে নাকি আর এই আউরের ঘর ? সব পাকা ইমারত হয়ে যাবে দেখো। আর তখন সব মধ্যস্বত্ব কিনবো—প্রজা বসিয়ে দেব, রায়ত আর কোলরায়ত—গায়ে মাটি মেখে লাঙল আর বাইতে হবে না তোমাকে। তখন খাজনা নেব—নগদ আর ধানকড়ারি।'

'গায়ে মাটি মাখবো না তবে বাঁচবো কি করে ?'

আজিজ আবার হেসে ওঠে : 'সাবান মেখেও দিব্যি বাঁচা যায় বাপজান, ভাবনা কী ?'

না, দরিয়ার পারে এনে না' ডুবানো যায় না, কিন্তু কোথায় পাবে টাকা ? মহালের মহাজনরা সব খুতির মুখ দিয়েছে বন্ধ করে, একপয়সা কেউ কর্জ দেয় না। সাদা খত দূরের কথা, রেহানী খতেও টাকা ছাড়তে কেউ রাজি নয়। তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে। রেজাইখানা কাঁধে চাপিয়ে আমানত হাজী সাহেবের বাড়ির দিকে রওনা হলো।

আজি শুনেই হাজীসাহেব তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো : 'আবার টাকা ধার করতে এসেছ কোন মুখে হে আমু মিয়া ? দু' দুখানা বন্ধকী তমস্থক—দু' বিঘে আর তিন বিঘে—বোর্ডের কারসাজিতে বেমালুম ছাড়িয়ে নিয়ে গেলে—আবার টাকা কিসের হে ? অভ্যেস এখনো শোধরালো না দেখছি।'

'ছেলের পরীক্ষার ফিস দিতে হবে, গোটা পঞ্চাশ টাকা চাই হাজীসাহেব। খাইখালাসী নিন কটকবালা নিন—যা আপনার পছন্দ। দু'বার করে তো আর বোর্ডে যেতে পারবো না।'

'অত সব ঘোরপ্যাচের মধ্যে নেই বাবু। সোজাসুজি সাফকবলা করতে পারো তো দেখতে পারি।'

'কতখানি চাই কত টাকায় ?' আমানত আড়ষ্টের মতো জিগগেস করলে।

'ঐ পাঁচ বিঘেই আমার চাই—যা তুমি তখন ফাঁকি দিয়ে কেড়ে নিয়েছ। ঐ পাঁচ বিঘে আওল জমি বিক্রি করো তো একশো টাকা দিতে পারি।'

'কিন্তু হালফিল একশো টাকার আমার দরকার নেই।' আমানত যেন নিশ্বাস ফেললো।

'টাকার আবার দরকার নেই কার ? এ যে নতুন বাত শোনাচ্ছ মিয়া। খরচ করতে না চাও দর-পরদা রেখে দাও জমিয়ে।'

'কিন্তু কান্দর জমি—বিঘে প্রতি দাম মোটে কুড়ি টাকা ?'

'ঢোলসহরৎ করে দেখলেই পারো। না পোষায় অন্য জায়গায় পথ দেখ। আমি এক কথার গাহেক। খাতিরনাদারৎ।'

'দু' বিঘে নিন না—দু' বিঘেতে পঞ্চাশ টাকা ফেলে দিন। ফরমানি করুন, হাজীসাহেব।' আমানত মাটির উপর লুটিয়ে পড়লো।

'বলি, গরজটা কার হে, আমু মিয়া ? এক লপ্তে জমি চাই পাঁচ বিঘে—সবই তোমার এক কদরের জমি নয়, কান্দরের সঙ্গে ডাঙ্গাও কিছু আছে—দাগ-খতেন আমার মুখস্ত। তোমার টাকার দরকার কম হতে পারে কিন্তু আমার জমির দরকার কম নয়। রাজি থাকো তো কবলার মুসাবিদা

করে ফেলি। পরে আধি নিতে চাও তো নিতে পারো—ফসল যখন করা হয়ে গেছে। বুঝলে, এর বেশি মহকুফ চলবে না।'

কী দমবাজ, কী ছুঁদে—আমানত ভাবে, কিন্তু দাঁত ফোটাতে পারে না।

উপায় কী—কোথায় নইলে টাকা! তার আজিজ নইলে মানুষ হয় কী করে। সাত দিন পরে ফিস দেবার শেষ তারিখ, আজিজ তাগিদ পাঠিয়েছে। ঘুরঘুট্ অন্ধকারে আমানত দিক-বিদিক দেখতে পায় না, কবালার গায়ে কোনাকুনি বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের টিপ দিয়ে ফেলে।

ধানের শীসে আগুনের শিস—সমস্ত মাঠ ভরে গেছে এখন সোনার আমেজে। পাঁচ বিঘে চকবন্দী করে দিয়ে গেছে হাজীসাহেবের জমানবীশ। গা-গতর ঢেলে চাষ করেও ফসলের আর্দ্ধেক শুধু তার।

'এই পঞ্চাশ টাকা তোর কাছে রেখে দে, নেকজানের মা।'

'কী, আমার পৈছে হবে নাকি?' নেকজানের মা ঘুরে দাঁড়ায়।

'ঢামালি করিস নে। মেজাজ আমার আজ রুঠা হয়ে গেছে।'

'কেন, হয়েছে কী? টাকা পেলে কি করে?'

'লুটতরাজ করে। নাউড়ে হয়ে এবার ডাকাতি করতে বেরুবো।' আমানতের চোখ ছলছল করে ওঠে।

'বলো সত্যি করে, টাকা কে দিলো।'

'আর কে দেবে, নেকজামের মা? আমার এই জমি আমার এই জায়দাদ ছাড়া আর কে ছিলো আমার? আমি একটা আহাম্মক, সব ভুট করে দিলাম।'

'কী, জমি বিক্রি করেছ বুঝি? কতখানি? এবার কি সব তবে ভুকমানি হয়ে মারা যাবো নাকি?' নেকজানের মা চোখে আঁচল চাপা দিল।

'ভয় নেই নেকজানের মা, আমাদের আজিজ আছে। রহমান আছেন। আবার সব ফিরে পাবো।'

ধান কেটে খলেনে ভাগ হয়ে গেল। গাড়ি বোঝাই হয়ে গেল হাজীসাহেবের। আউড়ের কুটোটি পর্যন্ত সে কুড়িয়ে নিলে। আমানতের দেহে যেন আর জোর নেই, জেল্লা নেই, শিটা হয়ে আসছে দিন-দিন।

মজুদ পঞ্চাশ টাকা রাখা গেল না সরিয়ে—উড়াল দিয়ে চলে গেল। আজিজ যাবে সহরে পরীক্ষা দিতে। রাহা-খরচ আছে, খোরাকি আছে, জামা-কাপড় আছে—ফরদা সে খরচের ফর্দ। এদিকে ধুলধেকড়া সব ছেলেপিলেদের পরনে।

তবু, যতটা পেরেছিলো রেখেছিলো আমানত হাতের মুঠ আঁট করে, শোনা গেল মাষ্টার সাহেবের ছ' মাসের পাওনা বাকি আছে কুড়ি টাকা।

'ফকিরফোকরা হয়ে বেরিয়ে যাবে নাকি শেষকালে?' নেকজানের মা ঝামটা দিয়ে ওঠে।

'কী যে বলিস তার ঠিক নেই। আজিজ আমাদের মসনদে বসাবে। তুই থাকিস ইমারতে, নেকজানের মা, আমি আমার ভুঁইয়ে বুক দিয়ে পড়ে থাকবো।'

আরো পাঁচ বিঘে এখনো আছে। ঝাঁ ঝাঁ করে আকাশ, মেঘের ছিটেফোঁটা নেই আনাচে কানাচে। আমানত আকাশের দিকে তাকায় আর লাঙল ঠেলে। পানিপশালা এবার আর হলো না এ-তল্লাটে।

আধপেটাও বুঝি আর জোটে না। এবার বোধহয় নগদা মজুরিতে পাইট খাটতে হয়।

না, রহমান আছেন। টেনেবুনে আজিজ পাশ করেছে। চাষার ছেলে আজ তাকে আর কে বলে। বদলে গেছে তার নামনিশানা।

'কী করবি, আজিজ?' জিজ্ঞাসা করতেও যেন সম্ভ্রম হয়।

'পড়াবার তো আর মুরোদ নেই তোমার, এবার তাই চাকরি নেব।'

চাকরি আছে গোটাকতক। আদালতের আমলা। প্রাথমিক একটা পরীক্ষা হবে লোকদেখানো। জেলার সেরেস্তাদারকে যে ভারি হাতে খাওয়াতে পারবে তারটাই অবধারিত, আর সব খারিজ।

'একশো টাকায় রফা হয়েছে, বাপজান।'

'আবার টাকা!'

কিন্তু চমকে ওঠার কিছু নেই। নৌকো শুধু পারে ভিড়ালেই চলবে না, নোঙর নামাতে হবে। টাকা দেবার জন্যে জমি রয়েছে এখনো নিটুট পাঁচ বিঘে।

দোয়াত-কলম ষ্ট্যাম্প-ইসাদি নিয়ে হাজীসাহেব এসে হাজির। পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—বাকি পাঁচ বিঘেও লোপাট হয়ে গেল।

সদর থেকে আজিজ চাকরির খবর নিয়ে এলেও আমানতের কান্না থামলো না: 'একেবারে ফৌত-ফেরার হয়ে গেলাম, নেকজানের মা।'

বাপ-পিতেমোর ভিটেটুকুই শুধু আছে। কিন্তু কী হবে তার এই বাস্তু দিয়ে যদি আর তাতে বস্তু না থাকে এক কণা!

আজিজ সবাইকে সহরে নিয়ে এলো, তার কর্মস্থলে। ত্রিশ টাকা মাইনেতে টায়েটুয়ে সে চালিয়ে নেবে সংসার। এদিক-ওদিক আছে কিছু উপরি—

ঘাঁতঘোঁত সে এরি মধ্যে দোরস্ত করে নিয়েছে। এলেমদার ছেলে সে—কাউকে পরোয়া করে না।

কিন্তু ছিলিম খেয়েও আমানত আর আগের স্বাদ পায় না, শ্রান্তদেহে তামাকের সে ধার। দু দিনেই তার গতুরে শরীর কেমন ধসকে গেছে, বাত জমে উঠছে গাঁটে-গাঁটে। মেজছেলের বৌটা আলাদা হয়ে গেছে, বড়োছেলের বৌটাও যাব-যাব করছে। নেকজানের মা রয়েছে এখনো তাকে আঁকড়ে। কিন্তু একেক সময় ইচ্ছে করে আমানতের, তাকে তিন-তালাক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে আবার তার মাটির আকর্ষণে—কাঁচা-সোনা-গা নয়লী যৌবনী কাউকে সাদি করে ফের বুড়ো বয়সে, এক ফৌজ সৃষ্টি করে সে মাটির উপর, দিগন্ত পর্যন্ত সে সবুজের তরঙ্গ তুলে দেয়।

তার দিন আর কাটে না। অনড় হয়ে আসে তার হাত-পা। খাবার পর ঢেঁকুর ওঠে। তাই আজিজ তাকে বাজারে একটা খোপরি ভাড়া করে দিয়েছে। আমানত সেখানে বসে চোখে চশমা লাগিয়ে সেলাইর কল চালায়। ফতুয়া বানায়, কুর্তা বানায়, সার্ট বানায়। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যবসা। আমানত আর চাষা নয়, খলিফা। আজিজ আর চাষার ছেলে নয়, খলিফার ছেলে। অনেক নরম লাগে শুনতে।

কিন্তু যেদিন আকাশ কালো করে টিনের চালের পরে বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্ করে, আমানতের পা-কল কেমন আপনা থেকেই থেমে যায়—বৃষ্টিটা মনে হয় যেন কান্নার শব্দ; আর সেই শব্দে ভেসে আসে তার মাটির ডাক। তার মাটি তাকে ডাকে—ডাকে—অনেক দূর পর্যন্ত ডাকে। বলে, আমানত, চলে আয়।

বাঙালীর ইতিহাসের কাঠামোঃ আদিপর্ব

নীহাররঞ্জন রায়

বাঙ্‌লার ইতিহাস ও বাঙালীর ইতিহাসে প্রভেদ কোথায়, একথা বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। আমি যে-বিষয়ের আলোচনা করিতে চাই, তাহাকে বাঙ্‌লার ইতিহাস বলিলে আপত্তি করিবার কিছু নাই, তবু, বাঙালীর ইতিহাস যখন বলিতেছি, তখন তাহার কারণ নিশ্চয়ই একটু আছে।

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বাঙ্গলার ইতিহাস" রচনা করিয়া গিয়াছেন, সম্প্রতি এই বইয়ের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত "Palas of Bengal" বাঙ্‌লার ইতিহাসের এক বিস্তীর্ণ অধ্যায় সম্বন্ধে এখনও প্রামাণ্য গ্রন্থ। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের "গৌড় রাজমালা" ঐতিহাসিকের কাছে সুপরিচিত। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ও তাঁহার প্রাক্তন ছাত্র প্রমোদ লাল পাল মহাশয়, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, বিনয়চন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র রায়, স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার, রজনীকান্ত চক্রবর্তী, গিরীন্দ্রমোহন সরকার এবং আরও অনেকে বাঙ্‌লার ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় রচনায় বিচিত্র ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, এবং একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ইঁহাদের এবং অন্যান্য অনেকের সম্মিলিত গবেষণার ফলে আজ প্রাচীন বাঙ্‌লার ইতিহাস আমাদের কাছে অল্পবিস্তর সুপরিচিত; অন্ততঃ মোটামুটি কাঠামোটা সম্বন্ধে এখন আর অস্পষ্ট ধারণা কিছু নাই। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের গবেষণার ফলে, সমবেত চেষ্টার ফলে প্রাচীন বাঙ্‌লার ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি, তাহা প্রাচীন রাজবংশাবলীর কথা—রাজা, রাজ্য, রাজধানী, যুদ্ধবিগ্রহ এবং জয়-পরাজয়ের কথা মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি, মুষ্টিমেয় কয়েকজন রাজকর্মচারীদের সম্বন্ধেও কিছু কিছু না জানি, এমন নয়। বাঙ্‌লা দেশ সম্পর্কিত যে সমস্ত প্রাচীন লেখমালা ও যে ২।৪ খানা সাহিত্য গ্রন্থ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও এই সব রাজকীয় সংবাদ ছাড়া, রাজা রাজড়ার কথা ছাড়া কিংবা রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতির কথা ছাড়া আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। কোনও কোনও সম্পাদক, যথা, স্বর্গত পদ্মনাথ

ভট্টাচার্য, ননীগোপাল মজুমদার, পারজিটার, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী, রাধা-গোবিন্দ বসাক, প্রভৃতি মহাশয়েরা সমাজ সম্বন্ধেও কিছু কিছু তথ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন ; কিন্তু এই সমাজ বর্ণাশ্রম-শাসিত সমাজ। একথা ভুলিলে চলিবে না যে, এই সমাজ-সংবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ ও অন্য ২।১টি উচ্চবর্ণের সমাজ-সংবাদ। তাঁহাদের কথিত সামাজিক অবস্থা অথবা social condition-এ 'সমাজ' কথাটা অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে, বর্ণ-সমাজ অর্থে ব্যবহৃত, এবং সে-সংবাদও অত্যন্ত অপ্রচুর। মোটামুটি ইহাই এপর্যন্ত বাঙ্‌লার ইতিহাসের উপাদান ; এ যাবৎ গ্রন্থাকারে বা সুদীর্ঘ প্রবন্ধাকারে যত বাঙ্‌লার ইতিহাস রচিত হইয়াছে, তাহাতে রাজা, রাজ্য, রাজকর্মচারী, রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি, এবং বর্ণ-সমাজ সম্বন্ধীয় সংবাদ ছাড়া আর কিছু পাই না। ইহাই বাঙ্‌লার ইতিহাস।

আরও কিছু আছে। ধর্ম, শিল্প, ও সাহিত্য সম্বন্ধেও আমরা কিছু কিছু জানি। এ বিষয়ে সর্বাগ্রে স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম করিতে হয়। প্রাচীন বাঙ্‌লার বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে তিনিই আমাদের সজাগ করিয়াছেন। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী প্রভৃতি মহাশয়দের চেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ঢাকা চিত্রশালা, ও বাঙ্‌লার অন্যান্য ক্ষুদ্র বৃহৎ চিত্রশালার সহায়তায় প্রাচীন বাঙ্‌লার ধর্ম ও শিল্প-সংস্কৃতি সম্বন্ধেও আমাদের দৃষ্টি ও জ্ঞান অনেকটা সুস্পষ্ট। এ-বিষয়ে শ্রীমতী ষ্টেলা ক্রামরিশ, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী, সরসীকুমার সরস্বতী, অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী, স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি পণ্ডিতেরা ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের পথ সুগম করিয়াছেন। কিন্তু একথা সত্য যে, এপর্যন্ত কি বাঙ্‌লা ভাষা কি ইংরাজী অথবা অপর কোনও ভাষায় এ যাবৎ প্রামাণ্য কোনও গ্রন্থ রচিত হয় নাই, কিংবা প্রাচীন বাঙ্‌লার সংস্কৃতির পরিপূর্ণ একটা রূপ আমাদের সম্মুখে এখনও গড়িয়া উঠে নাই। তাহা ছাড়া ধর্ম, শিল্প অথবা সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা যতটুকুও বা জানি, তাহাও বর্ণ-ধর্মের কথা, সভা-শিল্প বা সভা-সাহিত্যেরই কথা, যে-ধর্ম উচ্চতর বর্ণাশ্রমীদের, যে-শিল্প অথবা সাহিত্য রাজসভায় বা বিত্তশালী বণিক অথবা গৃহস্থের পোষকতায় পুষ্ট, লালিত ও বর্দ্ধিত, যে-শিল্প বা সাহিত্য বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুশাসন ও সাধন-পদ্ধতির দ্বারা শাসিত, সেই ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্যের কথা। লোক-ধর্ম, লোক-শিল্প, লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না বলিলেই চলে ; একমাত্র স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের গবেষণায় তাহার আভাস কিছু কিছু পাওয়া যায়।

অথচ দেশে রাজা ও রাজপাদোপজীবি কয়জন ? রাষ্ট্রশাসন যন্ত্র যাহারা পরিচালন করেন তাহারাই বা কয়জন ? যুদ্ধবিগ্রহ নিত্য হইত না, সমগ্র ইতিহাসে তার স্থান কতটুকু ? আজিকার দিনের যুদ্ধবিগ্রহের মত তখনকার দিনের যুদ্ধবিগ্রহ সমাজের মূল ধরিয়া টান দিত না ; যুদ্ধ যুদ্ধের স্থান, রাজা, সেনাধ্যক্ষ, সেনাবাহিনী, রাজসভা, রাজকর্মচারী ইহাদের মধ্যেই আবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ থাকিত, এবং যুদ্ধের ফলাফল নিকট ও দূর ভবিষ্যতকে একান্ত ভাবে রূপান্তরিত করিতেও পারিত না। রাজা ও রাজসভার বাহিরে ছিল অগণিত জনসাধারণ, বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত, বিভিন্ন বৃত্তি ও ধর্ম বিশ্বাস দ্বারা শাসিত, বিভিন্ন শ্রেণীর সীমায় আবদ্ধ, ঠিক এখন যেমনটি আমরা দেখি। তবু বর্তমান কালে, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা ভারতবাসীর জীবনে যতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ, প্রাচীনকালে সেই রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা জনসাধারণের জীবনকে এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিত না। এক রাজা পরাজিত হইয়াছেন, অন্য রাজা রাজমুকুট পরিয়া রাজসিংহাসনে বসিয়াছেন ; তাহাতে অগণিত জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নাই, বৃহত্তর সমাজ-ব্যবস্থারও খুব একটা ওলোট্‌পালোট কিছু হইয়া যায় নাই।

আসল কথা, রাজা ও রাষ্ট্রযন্ত্র সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থার রক্ষক ও নিয়ামক মাত্র। রাজা ও রাষ্ট্রের দায়ীত্ব এই সমাজ-ব্যবস্থাকে রক্ষণ ও পালন করা ; আর সমাজের দায়ীত্ব রাজা ও রাষ্ট্রকে প্রতিপালন করা। সমাজ আছে বলিয়াই রাষ্ট্র এবং রাজাও আছেন, সমাজহীন রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না। রাজা ও রাষ্ট্র সমাজেরই অঙ্গ। এই সমাজের বস্তুভিত্তি হইতেছে ধন। কারণ দৈনন্দিন জীবনে ব্যক্তির পক্ষে ধন যেমন অপরিহার্য্য, সমষ্টির পক্ষেও তাহাই। ধন না হইলে সমাজ চলে না, রাজা ও রাষ্ট্র প্রতিপালিত হয় না। এই ধন উৎপাদনের তিন উপায় প্রাচীন বাঙ্‌লায় দেখিতে পাওয়া যায়—শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি। এই তিন উপায় তিন শ্রেণীর করায়ত্ত—শিল্পী শ্রেণী, বণিককুল ও ক্ষেত্রকর অথবা কৃষককুল। ইহাদের উৎপাদিত অর্থ দ্বারা সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রতিপালিত হইত। এবং এই তিন শ্রেণী ও রাষ্ট্র সকলে মিলিয়া উৎপাদিত ধন বণ্টনের ব্যবস্থা করিতেন। কাজেই রাজা ও রাষ্ট্র ছাড়া সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে এই তিন শ্রেণীর অর্থাৎ ধনোৎপাদক শ্রেণীর একটা বিশেষ স্থান ছিল এবং রাজা ও রাজকর্মচারীদের অপেক্ষা ইহারা যে সংখ্যায় অনেক বেশী ছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। অথচ, ইহাদের সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। ধনোৎপাদন প্রণালী, ধন বণ্টন, ভূমি-

ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি অল্পই আছে।

উপরে যে শিল্পী, বণিক ও কৃষককুলের কথা বলিলাম, ইহাদের জীবন যে শুধু ধনসর্বস্বই ছিল একথা বলা চলে না—ইহাদের জীবন এবং ইহাদের রক্ষা ও পালন যাহারা করিতেন সেই রাজা ও রাজপাদোপজীবিদের জীবনে ধর্ম ও শিল্পের, শিক্ষা ও সাহিত্যের, এক কথায় সংস্কৃতির প্রয়োজনও ছিল। এবং সেই সংস্কৃতি স্বভাবতই এমন হওয়া প্রয়োজন ছিল যাহা তদানীন্তন সমাজ-সংস্থানের পরিপন্থী নয়। এই সংস্কৃতির পুষ্টি ও পরিপালন ধনসাপেক্ষ। সেই ধন সমাজের উদ্বৃত্ত ধন; দৈনন্দিন একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার নির্বাহ করিয়া যে-ধন থাকিত সেই ধনের কিয়দংশ যাহারা দিতেন এবং দিতে সমর্থ ছিলেন তাহারাই পরোক্ষভাবে সংস্কৃতির আদর্শ নির্ণয় করিতেন শুধু তাহাই নয়, সমাজের আদর্শেরও তাহারাই ছিলেন নিয়ামক। অপরোক্ষ ভাবে ইহাকে রূপদান করিতেন ব্রাহ্মণেরা—শিক্ষা ও ধর্মাচরণের, সামাজিক স্মৃতি ও ব্যবহারাদি প্রণয়নের দায়ীত্ব ছিল তাহাদের। এই দায়ীত্ব তাহারা পালন করিতেন বলিয়া সমাজের মধ্যে সমর্থ শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহ ব্রাহ্মণদের প্রতিপালন ও ভরণপোষণের দায়ীত্ব গ্রহণ করিত। সংস্কৃতির বাহক এই ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে এবং এই সংস্কৃতির আদর্শ সম্বন্ধেও আমরা কিছু জানি না বলিলেই চলে। অথচ এই ব্রাহ্মণেরাও সমাজের বিশেষ একটি অঙ্গ, এবং এই সংস্কৃতির স্বরূপ এবং ইতিহাসও বাঙ্‌লার এবং বাঙালীর ইতিহাসের কথা।

রাজা, রাজপদোপজীবি, শিল্পী, বণিক, কৃষক, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শ্রেণীর অসংখ্য লোকের বিচিত্র প্রয়োজনের সেবার জন্য ছিল আবার অগণিত জনসাধারণ। ইহাদের অশন, বসন, আরাম, বিলাস, দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র কর্তব্য, সুখ সুবিধা সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন হইত নানা শ্রেণীর, নানা বৃত্তির অসংখ্যতর ইতর জন—পুরাতন লিপিমালায় যাহাদের বলা হইয়াছে অকীর্তিত বা অনুল্লিখিত জনসাধারণ। ইহাদের ছাড়াও সমাজ চলিত না; এই অকীর্তিত জনসাধারণও সমাজের অঙ্গ বিশেষ, এবং সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে ইহাদেরও স্থান ছিল। অথচ ইহাদের কথাও আমরা কিছুই জানি না। ইহাদেরও ধর্মবিশ্বাস ছিল, সংস্কৃতির একটা ধারা ছিল, জীবন-যাত্রার প্রণালী ছিল, উৎপাদিত ধনের খানিকটা, খুব ক্ষুদ্রতম অংশ হইলেও, ইহাদের হাতে আসিত কোন না কোন সূত্র ধরিয়া, অথচ এসব সম্বন্ধেও আমরা কিছু জানি না।

কাজেই, রাজা, রাষ্ট্র, রাজপদোপজীবি, শিল্পী, বণিক, মানপ, কৃষক, ব্রাহ্মণ, "অকীর্তিতান আচণ্ডালান," ইহাদের সকলকে লইয়া প্রাচীন বাঙ্‌লার সমাজ। ইহাদের সকলের কথা লইয়া তবে বাঙালীর কথা, বাঙালীর ইতিহাসের কথা, শুধু রাজা ও রাষ্ট্রকে লইয়া নয়। এই অর্থেই আমি "বাঙালীর ইতিহাস" কথাটা ব্যবহার করিতেছি। বাঙালী সমাজও এই বৃহত্তর অর্থেই বুঝিতেছি।

অথচ এই অর্থে বাঙ্‌লার অথবা বাঙালীর ইতিহাস সম্বন্ধে মনীষি ঐতিহাসিকেরা সকলেই কিছু একেবারে সজাগ ছিলেন না, একথা সত্য নয়। বহুদিন আগে বঙ্কিমচন্দ্র যখন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না···" তখন তিনি শুধু রাজা ও রাষ্ট্রের ইতিহাসের কথাই বলেন নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন বাঙ্‌লার সেই ইতিহাস যে ইতিহাস বলিবে, "রাজশাসন প্রণালী কিরূপ ছিল, শান্তিরক্ষা কিরূপ হইত। রাজসৈন্য কত ছিল, কি প্রকার ছিল, তাহাদের বল কি, বেতন কি, সংখ্যা কি?···কত প্রকার রাজকর্মচারী ছিল···? কে বিচার করিত···দণ্ডের পরিমাপ কিরূপ ছিল, প্রজার সুখ কিরূপ ছিল? ধান্য কিরূপ হইত, রাজা কি লইতেন, মধ্যবর্তীরা কি লইতেন, প্রজারা কি পাইত, তাহাদের সুখদুঃখ কিরূপ ছিল? চৌর্য্য, পূর্ত, স্বাস্থ্য, এসকল কিরূপ ছিল? কোন্ কোন্ ধর্ম প্রচলিত ছিল,—বৈদিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, চার্বাক, বৈষ্ণব, শৈব, অনার্য্য কোন্ ধর্ম কতদূর প্রচলিত ছিল? শিক্ষা, শাস্ত্রালোচনা কতদূর প্রবল ছিল?···তখনকার লোকের সামাজিক অবস্থা কিরূপ? সমাজ ভয় কিরূপ? ধর্ম ভয় কিরূপ···বাণিজ্য কিরূপ, কি কি শিল্পকার্যে পারিপাট্য ছিল? কোন্ কোন্ দেশোৎপন্ন শিল্প কোন্ কোন্ দেশে পাঠাইত?···ভিন্ন দেশ হইতে কি কি সামগ্রী আমদানী হইত, পণ্যকার্য কি প্রকারে নির্বাহ হইত?" এক কথায় বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর ইতিহাস রচনা কামনা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বহুদিন পরে আর এক বাঙালী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতেও এই বাঙালীর ইতিহাসের কল্পনা ধরা দিয়াছিল। "গৌড় রাজমালা" গ্রন্থের ভূমিকায় স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়া ছিলেন, "রাজা, রাজ্য, রাজধানী, যুদ্ধবিগ্রহ এবং জয়পরাজয়—ইহার সকল কথাই ইতিহাসের কথা। তথাপি কেবল এই সকল কথা লইয়াই ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না। বাঙালীর ইতিহাসের প্রথান কথা—বাঙালী জনসাধারণের কথা।" এই বাঙালী জনসাধারণের কথা এপর্যন্ত বাঙলার ইতিহাসে কীর্তিত হয় নাই।

কেন হয় নাই তাহার কারণ খুঁজিতে খুব বেশী দূর যাইতে হয় না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে ঐতিহাসিক গবেষণার যে-পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি বাঙ্‌লা দেশে তথা ভারতবর্ষে প্রচলিত সে-পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি আমরা শিখিয়াছি সমসাময়িক য়ুরোপীয় ঐতিহাসিক গবেষণা হইতে। এই পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি একান্তভাবেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক, এবং রাজা ও রাষ্ট্রই এই গবেষণার কেন্দ্র। সামাজিক চেতনা এই পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গিকে উদ্বুদ্ধ করে নাই। স্থূল দৃষ্টিতে দেখা যায় রাষ্ট্রই সকল ব্যবস্থার নিয়ন্তা, যেদিকে তাকান যায়, সেদিকে রাষ্ট্রের সুদীর্ঘ বাহু বিস্তৃত, ইহাই চোখে পড়ে, এবং সেই রাষ্ট্রও কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টিকেই যেন আশ্রয় করিয়া আছে, ইহাই সর্বজন গোচর হয়। অথচ, এই রাষ্ট্রের পশ্চাতে যে রহিয়াছে বৃহত্তর সমাজ, সেই বৃহত্তর সমাজে যে চলিতেছে শ্রেণী বিশেষের আধিপত্য তাহা সহজে চোখে পড়িতে চায় না। সমাজ বিকাশের অমোঘ নিয়মের বশেই যে রাজা ও রাষ্ট্রের সৃষ্টি, একথা উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী ঐতিহাসিক গবেষণা স্বীকার করে নাই। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রেও তখনও পর্যন্ত ফরাসী বিপ্লবের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিজয় পতাকা উড়িতেছে। আমরা তাহার অনুকরণ করিয়াছি মাত্র। ঐতিহাসিক মালমসলা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি সেইজন্যই বিশেষভাবে রাজা ও রাষ্ট্রের দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং সমাজ সম্বন্ধেও তথ্য যখন আহরণ করা হইয়াছে, তখন 'সমাজ' অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থেই বুঝিয়াছি এবং ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ হইতেই য়ুরোপের কোথাও কোথাও বিশেষ-ভাবে অষ্ট্রিয়া ও জর্মাণ দেশে সমাজ বিকাশের ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রপাত হয়, এবং তাহার ফলে সর্বত্র পণ্ডিত-সমাজ একথা স্বীকার করিয়া লয় যে ধনোৎপাদনের প্রণালী ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন কালের সমাজ-সংস্থান নির্ভর করে, বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণী এই ব্যবস্থা আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠে, এই ব্যবস্থাকে রক্ষণ ও পালন করিবার জন্যই রাজা ও রাষ্ট্র প্রয়োজন হয়, এবং এই সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করিবার জন্যই একটি বিশেষ সংস্কৃতির উদ্ভব ও পোষণের প্রয়োজন হয়। সমাজ বিকাশের এই বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ক্রমশ সমগ্র য়ুরোপে ছড়াইয়া পড়ে, এবং গত মহাযুদ্ধের পর হইতে ইংরাজ ঐতিহাসিকদের মধ্যেও এই ব্যাখ্যার প্রভাব দেখা দেয়। য়ুরোপে যাহা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং যাহার ঢেউ বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্ততটে আসিয়া আঘাত করিয়াছিল, মহাযুদ্ধের পর হইতে

ইংলণ্ডেও সেই people's history, history of the common people লেখার সূত্রপাত হইয়াছে। ইহার কিছুদিন আগে হইতেই সমাজ, সামাজিক ধন, রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ, রাষ্ট্র ও বিভিন্ন শ্রেণীর সম্বন্ধ, রাষ্ট্র ও ধর্ম এবং সংস্কৃতির সম্বন্ধ ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থ ইংলণ্ডেও রচিত হইতেছিল, কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই নূতন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির রূপ ক্রমশঃ আরও সুস্পষ্ট হইতেছে। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক গবেষণায় এই ইঙ্গিত বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদেও ধরা পড়িল না। এইজন্যই আজ পর্যন্ত বাঙালীর ইতিহাস অথবা ভারতবাসীর ইতিহাস রচিত হইতে পারে নাই।

উপরোক্ত ধ্যান ও ধারণাগত কারণ ছাড়া জনসাধারণের ইতিহাস রচিত না হওয়ার একটা বস্তুগত কারণও আছে। তাহা জনসাধারণের ইতিহাস রচনার উপযোগী উপাদানের অভাব। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে সমগ্রভাবেই এই অভিযোগ করা চলে, বাঙ্‌লা দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে ত চলেই। রাজা, রাজবংশ, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রাদর্শ ইত্যাদির ইতিহাসই প্রভূত যত্নে তিল তিল করিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, তবে আজ আমরা আমাদের ইতিহাসের অল্পবিস্তর স্পষ্ট একটা রূপ দেখিতে পাইতেছি। এখনও এমন কাল ও এমন দেশখণ্ড আছে যাহার ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। রাজা ও রাষ্ট্রের ইতিহাস সম্বন্ধেই যেখানে এই অবস্থা, সেখানে বৃহত্তর সমাজ ও সমাজের ইতিহাস সম্বন্ধে উপাদানের অপ্রাচুর্য থাকিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি। সমগ্র ভারতবর্ষের কথা বলিয়া লাভ নাই, বাঙালীর ইতিহাসের কাঠামো রচনা করিতে বসিয়া বাঙ্‌লা দেশের কথাই বলি। বাঙ্‌লার রাষ্ট্র ও রাজবংশাবলীর ইতিহাস যতটুকু আমরা জানি তাহার বেশীর ভাগ উপাদান জোগাইয়াছে প্রাচীন লেখমালা। এই লেখমালা শিলালিপিই হোক্ বা তাম্রলিপিই হোক্, ইহারা হয় রাজসভাকবি-রচিত রাজার অথবা রাজবংশের প্রশস্তি, কোনও বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে রচিত, অথবা কোনও ভূমি দান-বিক্রয়ের দলিল, অথবা কোন মূর্তি বা মন্দিরে উৎকীর্ণ উৎসর্গ-লিপি। ভূমি দান-বিক্রয়ের দলিলগুলিও সাধারণত রাজা অথবা রাজকর্মচারীদের নির্দেশে রচিত ও প্রচারিত। এই লেখমালার উপাদান ছাড়া কিছু সাহিত্য জাতীয় উপাদানও আছে; ইহার অধিকাংশই আবার রাজসভার সভাপণ্ডিত বা সভাপুরোহিত দ্বারা রচিত স্মৃতি অথবা ব্যবহার গ্রন্থ; ধোয়ীর "পবনদূত" বা সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" জাতীয় দুই-চারিখানি কাব্যও আছে, সেগুলি রাজ-সভাকবি দ্বারা রচিত। ইহা ছাড়া, সমসাময়িক অন্যান্য প্রদেশের লিপিমালা এবং ২১ খানি

গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু উপাদান পাওয়া যায়, কিন্তু এগুলির স্বরূপও বাঙ্‌লা দেশের লিপিমালারই অনুরূপ। ফাহিয়ান, য়ুয়ান্‌-চোয়াঙের মতন বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী, নেপালে ও তিব্বতে প্রাপ্ত নানা বৌদ্ধ ও কিছু কিছু অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধীয় পুঁথি হইতেও কতক উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে য়ুয়ান্‌-চোয়াঙ্‌ রাজ-অতিথি ছিলেন, এবং রাষ্ট্রের সহায়তায়ই ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। ফাহিয়ান্‌ রাজ-অতিথি না হইলেও বৌদ্ধ ধর্মগোষ্ঠীর অতিথিরূপেই নানা জায়গায় যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। আর তিব্বতে ও নেপালে প্রাপ্ত যে পুঁথিগুলির কথা বলিয়াছি তাহা ত একান্তভাবে বৌদ্ধধর্মবিহার ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের ছত্রছায়ায় বসিয়াই লেখা হইয়াছিল। তাহা হইলে দেখিতেছি, উপরে যতগুলি উপাদানের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অধিকাংশেরই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ উৎপত্তি স্থল হইতেছে হয় রাজসভা অথবা ধর্মগোষ্ঠী। একমাত্র রাজা অথবা রাজবংশের প্রশস্তিগুলি হইতেই এবং "রামচরিতে"র মতন সাহিত্য-গ্রন্থ হইতেই রাজা ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, আর "আর্য্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্প" জাতীয় অন্যান্য ধর্ম অথবা সাহিত্য গ্রন্থ, "ব্রাহ্মণ সর্বস্বে"র মত স্মৃতি অথবা ব্যবহার গ্রন্থ প্রভৃতি হইতে, কিংবা ভূমি দান-বিক্রয়ের তাম্রপট্ট হইতে যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহা পরোক্ষভাবে। কল্‌হনের "রাজতরঙ্গিণী" কিংবা বিহ্লনের "বিক্রমাঙ্কদেব চরিত" অথবা বাণভট্টের "হর্ষ চরিতে"র মতন কোন ইতিহাস গ্রন্থ বাঙ্‌লার ইতিহাস রচনায় সহায়তা করিতেছে না। এই অবস্থায়, রাজা, রাজবংশ, রাষ্ট্র ও যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস রচনার উপাদানই ত অপূর্ণ ও অপ্রচুর, সামাজিক ইতিহাসের ত কথাই নাই। তবে, রাজা, রাজবংশ ও রাষ্ট্রের ইতিহাসের উপাদান অপূর্ণ এবং অপ্রচুর হইলেও অন্যপক্ষের পক্ষপাতিত্ব দোষ তাহার উপর আরোপ করা যায় না, কারণ এ সমস্ত উপাদানই রাজা অথবা রাজবংশের কিংবা তাহাদের ও তাহাদের সমশ্রেণীর পোষকতায় লালিত ও বর্দ্ধিত ধর্মগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আশ্রয়ে রচিত।

উপরোক্ত উপাদানগুলি বাঙ্‌লার বৃহত্তর সামাজিক ইতিহাসেরও উপাদান। সমাজ সম্বন্ধে যে সংবাদ ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় তাহা যে শুধু পরোক্ষ সংবাদ তাহাই নয়, শুধু যে অপূর্ণ ও অপ্রচুর তাহাই নয়, কতকটা একদেশীয় একপক্ষীয় হওয়াও স্বাভাবিক। প্রথমতঃ সামাজিক ইতিহাসের সংবাদ দেওয়া তাহাদের উদ্দেশ্য নয়, যতটুকু পাওয়া যায় তাহা একান্তই পরোক্ষভাবে, বিবৃত ঘটনা ও পারিপার্শ্বিকের জন্য যতটুকু প্রয়োজন হইয়াছে ততটুকু সংবাদ মাত্রই পাওয়া যায়। সেইদিক হইতে

যতটুকু পাওয়া যায় তাহাই মূল্যবান্‌ এবং ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু এইসব উপাদানের উৎপত্তি স্থল হইতেছে রাজসভা বা ধর্মগোষ্ঠী, স্বভাবতই তাহাদের মধ্যে সমাজের অন্যান্য শ্রেণী বা গোষ্ঠী সম্বন্ধে যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহা যে অত্যন্ত স্বল্প তাহাই নয়, অপক্ষপাত দৃষ্টিও তাহার মধ্যে নাই। শিল্পী ও বণিক শ্রেণী, ক্ষেত্রকর ও শ্রমোপজীবি শ্রেণীর মতন সমাজের এমন প্রয়োজনীয় শ্রেণীদের সম্বন্ধেও এইসব উপাদান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নীরব। তাহা ছাড়া, সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস, বিশেষভাবে সামাজিক ইতিহাস রচনায় যে সাহায্য সমকালীন স্মৃতিশাস্ত্র, সূত্রশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র জাতীয় গ্রন্থাদি হইতে পাওয়া যায়, বাঙালীর ইতিহাস রচনায় সে সাহায্য পাওয়া যায় না বলিলেই চলে। অবশ্য ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, এই জাতীয় গ্রন্থ-বর্ণিত সামাজিক অবস্থা তদানীন্তন বাঙ্‌লা দেশেও হয়ত প্রচলিত ছিল; তবুও যেহেতু এই জাতীয় কোনও গ্রন্থ বাঙ্‌লা দেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা জানি না সেই কারণে বাঙালীর ইতিহাস রচনায় তাহাদের প্রমাণ অনুমানের অধিক মূল্য বহন করে না, এবং ঐতিহাসিকের কাছে অনুমানসিদ্ধ প্রমাণের মূল্য খুব বেশী নয় যদি সমাজবিকাশের প্রাকৃতিক নিয়মদ্বারা তাহা সিদ্ধ ও সমর্থিত না হয়। এইসব কারণেও বৃহত্তর সামাজিক ইতিহাস রচনার দিকে, বাঙালীর ইতিহাস রচনার দিকে আমাদের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন লিপিমালা এবং কিছু কিছু ধর্ম ও সাহিত্য গ্রন্থই বাঙালীর ইতিহাসের উপাদান এবং ইহাদের সাক্ষ্যই প্রামাণ্য। এই লিপিগুলি সমস্তই সমসাময়িক, ধর্ম ও সাহিত্য গ্রন্থগুলিও তাহাই। কোথাও কোথাও কিছু পরবর্তী অথবা পূর্ববর্তী প্রামাণ্য লিপি ও গ্রন্থের সহায়তা আমি গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সমসাময়িক সাক্ষ্য দ্বারা তাহা সমর্থিত না হইয়াছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার জন্য অনুমানের অধিক মূল্য কোথাও আমি দাবী করি না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি বাঙ্‌লা দেশের সাক্ষ্য প্রমাণই গ্রহণ করিয়াছি, তবে মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও আমি প্রতিবেশী কামরূপ রাজ্যের অথবা বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের সাক্ষ্য প্রমাণও উল্লেখ করিয়াছি। সেগুলি সিদ্ধ প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত না হইলেও একথা অনুমান করিতে বাধা নাই যে, বাঙ্‌লা দেশেও অনুরূপ রীতি ও পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

বাঙ্‌লা দেশের লিপিগুলি কালানুযায়ী সাজাইলে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া তুর্কী বিজয়েরও কিছুকাল পর পর্যন্ত বিস্তৃত করা যায়;

তবে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্তই ধারাবাহিকভাবে পাওয়া যায়, এবং এই সাত আট শত বৎসরের সামাজিক ইতিহাসের রূপই কতকটা স্পষ্ট হইয়া চোখের সম্মুখে ধরা দেয়। পঞ্চম শতকের আগে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং একান্তভাবেই অনুমানসিদ্ধ। লিপিগুলির সাক্ষ্যপ্রমাণ ব্যবহারের আর একটু বিপদও আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতকে উৎকীর্ণ দামোদরপুর (পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি) প্রাপ্ত কোনও তাম্রপট্টে ভূমিব্যবস্থা অথবা রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে যে খবর হয়ত পাওয়া যায় তাহা যে দশম অথবা একাদশ শতকে সমতটমণ্ডল অথবা খাড়িমণ্ডল, কিংবা পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্য কোন মণ্ডল বা বিষয় সম্বন্ধে সত্য হইবে, এমন মনে করিবার কোনও কারণ নাই। এমন কি সেই শতকেরই বাঙলার অন্য কোনও ভুক্তি অথবা বিষয় সম্বন্ধে সত্য হইবে, তাহাও বলা যায় না। কাজেই যে-কোনও লিপি বর্ণিত যে-কোনও অবস্থা সমগ্রভাবে বাঙলা দেশ সম্বন্ধে অথবা সমগ্র প্রাচীনকাল সম্বন্ধে প্রযোজ্য নাও হইতে পারে। বস্তুতঃ, দেখা যায়, একই সময়ে বাঙলার বিভিন্ন স্থানে একই বিষয়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা, রীতি ও পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এইজন্যই সাক্ষ্যপ্রমাণ উল্লেখ করিবার সময় ইচ্ছা করিয়াই আমি লিপি বর্ণিত স্থান ও কালের উল্লেখ সর্বত্রই করিয়াছি; এবং সেই স্থান ও কালেই বর্ণিত বিষয় প্রযোজ্য, এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছি। তারপর বিশেষ কোন নিয়ম বা পদ্ধতি কতটুকু অন্য কাল ও অন্য স্থান সম্বন্ধে প্রযোজ্য, কি পরিমাণে সমগ্র বাঙলা দেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য তাহা লইয়া পাঠক অনুমান যদি করিতে চান তাহাতে ঐতিহাসিকের দায়ীত্ব কিছু নাই।

বাঙালীর ইতিহাসের এই কাঠামো প্রাচীন বাঙলার সমাজ-বিন্যাসের কাঠামো। এই সমাজ-বিন্যাসের ইতিহাসই প্রকৃত জনসাধারণের ইতিহাস। রাজা ও রাষ্ট্র এই সমাজ-বিন্যাসে যতটুকু স্থান অধিকার করে, ততটুকুই আমি ইহাদের আলোচনা করিয়াছি। এই সমাজ-বিন্যাসের বস্তুগত ভিত্তি, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও সমাজে তাহাদের স্থান, তাহাদের দায় ও দায়ীত্ব, বিভিন্ন বর্ণ ও বর্ণের সঙ্গে শ্রেণীর সম্বন্ধ, সমাজে ও রাষ্ট্রে বিভিন্ন বর্ণের স্থান, রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্বন্ধ, সংস্কৃতির স্বরূপ ইত্যাদি সমস্তই প্রাচীন বাঙলার সমাজ-বিন্যাসের তথা জনসাধারণের ইতিহাসের আলোচনার বিষয়। এই সমাজ-বিন্যাসের ইতিহাস কি করিয়া রচনা করিতে হয় তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায় ফিখ্ সাহেব রচিত বুদ্ধদেবের সমসাময়িক উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাস রচনায় (Fick, "Die Sociale Gielderung in Nordostlichen zu Buddhas Zeit")

অবশ্য জাতকের অসংখ্য গল্পে এবং প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থগুলিতে তদানীন্তন সমাজ-বিন্যাসের যে সুস্পষ্ট চিত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, প্রাচীন বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের উপাদানে সে স্পষ্টতা বা সম্পূর্ণতা একেবারেই নাই। তবু ইতিহাসের এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া উপাদানগুলি সযত্নে বিশ্লেষণ করিলে আজ মোটামুটি একটা কাঠামো গড়িয়া তোলা একেবারে অসম্ভব নয়। বর্তমান রচনায় তাহার চেয়ে বেশী কিছু চেষ্টাও করা হইবে না, সম্ভবও নয়। বাঙলা দেশে ঐতিহাসিক উপাদান আবিষ্কারের চেষ্টা খুব ভাল করিয়া হয় নাই; বেশীর ভাগ উপাদানের আবিষ্কার আকস্মিক এবং পরোক্ষভাবেই হইয়াছে। তবু ক্রমশঃ নূতন উপাদান সংগৃহীত হইতেছে, এবং আজ যাহা কাঠামো মাত্র, এই ক্রমশঃ আবিষ্কৃত উপাদানের সাহায্যে হয়ত এই কাঠামোকে একদিন রক্তে মাংসে ভরিয়া সমগ্র একটা রূপ দেওয়া সম্ভব হইবে।

সমাজ-বিন্যাসের অথবা বৃহত্তর অর্থে সামাজিক ইতিহাস রচনার একটা সুবিধাও আছে, রাষ্ট্রীয় ইতিহাস রচনায় যাহা নাই। রাষ্ট্রীয়, বিশেষভাবে রাজবংশের ইতিহাসে সন তারিখ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য; কোন্ রাজার পরে কোন্ রাজা, কে কাহার পুত্র অথবা দৌহিত্র, কোন্ যুদ্ধ কবে হইয়াছিল, তাহার চুলচেরা বিচার অপরিহার্য। সন তারিখ লইয়া সেইজন্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে এত তর্ক বিতর্ক। এই ইতিহাসে ঘটনার মূল্যই সকলের চেয়ে বেশী এবং সেই ঘটনার কাল-পরম্পরার উপরই ইতিহাসের নির্ভর। সামাজিক ইতিহাস রচনায় ঘটনার মূল্য বিশেষ নাই, সন তারিখের মোটামুটি কাঠামোটা ঠিক হইলেই হইল, দু'চার, দশ বিশ বৎসর এদিক সেদিক হইলেও সাধারণতঃ বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না, যদি না কিছু সামাজিক উপপ্লব সমাজের চেহারাটাই বদলাইয়া দেয়। তাহার কারণ সহজেই অনুমেয়। সামাজিক শ্রেণী বিভাগ, বর্ণ বিভাগ, ধনোৎপাদন ও বণ্টন প্রণালী, জাতীয় উপাদান, ভূমি-ব্যবস্থা, বাণিজ্য-পথ ইত্যাদি এক কথায় সমাজ-বিন্যাস দু'দশ বৎসরে কিংবা রাজা অথবা রাজবংশের হঠাৎ পরিবর্তনে রাতারাতি কিছু বদলাইয়া যায় না, অন্ততঃ প্রাচীন ভারতবর্ষে অথবা বাঙলা দেশে তাহা হয় নাই। প্রাচীন পৃথিবীতে সর্বত্রই ইহাই দেখা যায়। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বৃহৎ কিছু একটা উপপ্লব সংঘটিত হইলে সমাজ-বিন্যাসও বদ্‌লাইয়া যায়, কিন্তু তাহাও একদিনে, দু'চার দশ বৎসরে হয় না। বহুদিন ধরিয়া ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন চলিতে থাকে। আর্যদের ভারতাগমন তেমন একটা সামাজিক বিপ্লব। অনার্য অথবা আর্যপূর্ব সমাজ-বিন্যাস

ছিল একরকম, তারপর আর্যেরা যখন তাহাদের নিজেদের সমাজ-বিন্যাস লইয়া আসিল তখন দুই আদর্শে একটা প্রচণ্ড সংঘাত নিশ্চয়ই লাগিয়াছিল। সেই সংঘাত ভারতবর্ষে চলিয়াছিল হাজার বৎসর ধরিয়া, এবং ধীরে ধীরে তাহার ফলে যে নূতন ভারতীয় সমাজ-বিন্যাস গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাই পরবর্তী হিন্দু-সমাজ। আর্যপূর্ব জাতিদের মধ্যে কেহ কেহ যখন লৌহধাতুর আবিষ্কার করিয়াছিল, তখনও এইরকমই একটা সামাজিক বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল, কারণ এই আবিষ্কারের ফলে ধন-উৎপাদনের প্রণালী গিয়াছিল বদ্‌লাইয়া, এবং তাহার ফলে সমাজ-বিন্যাসও বদ্‌লাইতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু এই পরিবর্তনও একদিনে হয় নাই। প্রাচীন বাঙ্‌লায় ঐতিহাসিক কালে—প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা আমি বলিব না, তাহার কারণ সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া আমরা কিছুই জানি না—এমন কোন সামাজিক উপপ্লব দেখা দেয় নাই। যুদ্ধ বিগ্রহ যথেষ্ট হইয়াছে, ভিন্নদেশাগত রাজা ও রাজবংশ বহুদিন ধরিয়া বাঙ্‌লা দেশে রাজত্বও করিয়াছে, ভিন্নদেশাগত মুষ্টিমেয় সৈন্য ও সাধারণ প্রাকৃত জন নানা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া এদেশে নিজেদের রক্ত মিশাইয়া দিয়া বাঙালীর সঙ্গে এক হইয়াও গিয়াছে, কিন্তু এইসব ঐতিহাসিক পরিবর্তন বিপ্লবের আকার ধারণ করিয়া সমাজের মূল ধরিয়া টানিয়া সমাজ-বিন্যাসের চেহারাটাকে একেবারে বদ্‌লাইয়া দিতে পারে নাই। অদল বদল যে একেবারে হয় নাই তাহা নয়, কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহা খুব ধীরে ধীরে হইয়াছে, এখানে সেখানে কোন সমাজ-অঙ্গের রঙ্ ও রূপ একটু একটু বদলাইয়াছে, কোনও নূতন অঙ্গের যোজনা হইয়াছে কিন্তু মোটামুটি কাঠামোটা ঠিকই থাকিয়া গিয়াছে। অদল বদল যাহা হইয়াছে তাহা প্রাকৃতিক ও সমাজ-বিজ্ঞানের নিয়মের বশেই হইয়াছে। কাজেই রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের 'অজ্ঞাত যুগ' (dark age) সামাজিক ইতিহাসের দিক্ হইতে একেবারে অজ্ঞাত নাও হইতে পারে। পূর্বের এবং পরের সমাজ-বিন্যাসের ইতিহাস যদি জানা থাকে তাহা হইলে মাঝখানের ফাঁকটা কল্পনা ও অনুমান দিয়া ভরাট্ করিয়া লওয়া যাইতে পারে, এবং তাহা ঐতিহাসিক সত্যের পরিপন্থী না হওয়াই স্বাভাবিক। প্রাচীন বাঙ্‌লার সমাজ-বিন্যাসের ইতিহাসেও একথা প্রযোজ্য।

কিন্তু সুবিধার কথা যদি বলিলাম, অসুবিধার কথাও বলি। আগেই বলিয়াছি, জনসাধারণের ইতিহাস রচনার যে-সব উপাদান আমাদের আছে, তাহা রাজসভা বা ধর্মগোষ্ঠীর আশ্রয়ে রচিত। রাজসভা বা ধর্ম্মগোষ্ঠীর সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাতব্য

তাহার অনেকাংশ এই সব উপাদানের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর যে অগণিত জনসাধারণ তাহাদের রচিত বা তাহাদের আশ্রয়ে রচিত কোনও উপাদানই আমরা পাই না কেন? যে বণিক সম্প্রদায় দেশেবিদেশে ব্যবসা বাণিজ্য চালাইত তাহারা নিরক্ষর অথবা মূর্খ ছিল না, একথা অনুমান করা যায়; সমাজে তাহাদের স্থানও ছিল খুব উপরেই, রাষ্ট্রপরিচালনায় এবং সমাজ-ব্যবস্থায় তাহাদের প্রভুত্বও কম ছিল না, একথা অনুমানসাপেক্ষ নয়, তাহার প্রমাণও আছে, তথাপি তাহাদের কথা বিশেষভাবে কেউ বলে নাই। ইহা আশ্চর্য্য সন্দেহ কি? তাহারা নিজেরাও কেউ কিছু বলিয়া যায় নাই। ক্ষেত্রকর বা কৃষক সম্প্রদায় ও শিল্পী সম্প্রদায় সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে, যদিও সমাজে ক্ষেত্রকরদের আধিপত্য হয়ত খুব বেশী ছিল না। আর চণ্ডাল পর্যন্ত অকীর্তিত যে জনসাধারণ তাহাদের কথা নাই বলিলাম। ইহারা ত নিরক্ষরই ছিল, সমাজে ইহাদের আধিপত্য বলিয়াও কিছু ছিল, এমন মনে করিবারও কোন কারণ নাই। কাজেই ইহাদের সম্বন্ধে যে বিশেষ কিছু জানি না তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। কিন্তু কি শিল্পী, মানপ, ব্যাপারী অথবা বণিক সমাজ, কি ক্ষেত্রকর সম্প্রদায়, কি নিম্নতম সম্প্রদায়, ইহারা রাজসভা বা ধর্মগোষ্ঠী দ্বারা কীর্তিত না হইলেও কিংবা কীর্তনযোগ্য বিবেচিত না হইলেও, ইহাদের সকলের দৈনন্দিন সুখ দুঃখের, জীবন সমস্যার, নিজেদের বৃত্তি সম্পর্কিত নানা প্রশ্নের ও সাফল্যের প্রকাশ ও পরিচয় তদনীন্তন বাঙালী সমাজের মধ্যে কোথাও না কোথাও ছিলই; হয়ত সকল শ্রেণীর প্রকাশ ও পরিচয় সমভাবে একত্র কোথাও হইত না, হয়ত বিশেষ শ্রেণীর জীবনধারার প্রকাশ ও পরিচয় শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত। কিন্তু এই প্রকাশ ও পরিচয় যেভাবেই হউক, তাহা কোথাও লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে নাই; রাজসভাকবি বা রাজসভাপুষ্ট কবির কাছে অথবা ধর্মগোষ্ঠীর নেতা মহাপুরোহিত বা মহাব্রাহ্মণদের কাছে এইসব প্রকাশ ও পরিচয় লিপিযোগ্য মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। তাহা ছাড়া রাজসভা ও ধর্ম্মগোষ্ঠী ইহাদের উভয়েরই লেখ্য ভাষা ছিল সংস্কৃত। অথচ এই দেবভাষা যে প্রাকৃত জনের ভাষা ছিল না তাহা ত যে কোনও সংস্কৃত নাটক পড়িলেই বোঝা যায়। প্রাচীন বাঙ্‌লার প্রাকৃত জনের এই ভাষার কোনও পরিচয় আমরা পাই না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কৃত এবং অধুনা সুপরিচিত চর্য্যাপদগুলির ভাষা হয়ত এই প্রাকৃত ভাষা, কিন্তু এই সন্ধা ভাষায় রচিত দোঁহা ও গানগুলিকে ঐতিহাসিক উপাদান রূপে গ্রহণ করা নানা কারণেই একটু বিপজ্জনক। ধর্মের ইতিহাসে অবশ্য ইহাদের খানিকটা মূল্য আছে। ডাক ও খনার বচনগুলিতে কিছু কিছু সামাজিক

ইতিহাসের উপাদান আছে। পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন যে এই বচনগুলিতে সমাজের যে পরিচয় টুক্‌রা টুক্‌রা ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায় তাহা নিঃসংশয়ে খৃষ্টীয় দশম অথবা একাদশ শতকের, কিন্তু ঐতিহাসিকের বিপদ এই যে, এই বচনগুলি বর্ত্তমানে আমরা যে-রূপে পাই, যে-ভাষায় বর্তমানে ইহারা আমাদের হাতে আসিয়াছে, সে-রূপ ও সে-ভাষা এত প্রাচীন নয়। কাজেই মুখে মুখে প্রচলিত বচনগুলি পরবর্তীকালে ক্রমশঃ যখন লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তখন যে সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক যুগের সমাজের পরিচয় কিছু কিছু তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে নাই তাহার নিশ্চয়তা কি? "গোপীচাঁদের গীত," "আছের গম্ভীরা," মুর্শ্যদ্যা গান, প্রাচীন রূপকথা, ইত্যাদি সম্বন্ধেও এই সন্দেহ প্রযোজ্য, যদিও ইহাদের বিষয়বস্তু প্রাচীনতর কাল সম্পর্কিত। মধ্যযুগের বাঙ্‌লার আরও ২।৪ টি বাঙ্‌লা বই সম্বন্ধে একই কথা বলা চলে। আসল কথা হইতেছে, জনসাধারণ প্রাকৃতজনসুলভ ভাব ও ভাষায় তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের যে-সব সুখ দুঃখ, ক্ষুদ্র বৃহৎ জীবন সমস্যা ইত্যাদি প্রকাশ করিত তাহাদের গানে গল্পে বচনে গাথায় রূপকথার আড়ালে, তাহা কেহ লিখিয়া রাখে নাই, লোকের মুখে মুখেই তাহা গীত ও প্রচারিত হইয়াছে, এবং বহুদিন পড়ে তাহা হয়ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে যখন প্রাকৃত জনের ভাষা লেখ্য-মর্য্যাদা লাভ করিল। কিন্তু মুশ্‌কিল হইতেছে, এই সব প্রমাণ স্বসম্পূর্ণ স্বয়ংসিদ্ধ প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করিবার উপায় নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত সমসাময়িক প্রমাণ দ্বারা তাহা সমর্থিত না হয়।

(২)

সমাজ-বিন্যাসের সঙ্গে নৃতত্ত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেইজন্য বাঙালীর ইতিহাসের গোড়ার কথা বাঙালী জাতির কথা, বাঙালী জাতি গঠনের ইতিহাস। বাঙালীর আর্যত্ব কতটুকু? পণ্ডিতেরা আর্য্যাগমনের যে দুই ধারার কথা বলেন, যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে সেই আর্যরক্ত কি ঋগ্বেদীয় আর্যদের না পামীর মালভূমি ও তক্‌লামাকান্ মরুভূমি হইতে আগত আল্‌পাইন আর্যদের? আর্যপূর্ব জাতিদের কাহারা বাঙ্‌লা দেশের অধিবাসী ছিল, এই আর্যপূর্ব বাঙালীদের মধ্যে অষ্ট্রিক্, নেগ্রিটো বা ভূমধ্যীয় জাতিদের আভাস কতটুকু দেখা যায়, কোথায় কোথায় দেখা যায়? মঙ্গোলীয় ও ভোট-ব্রহ্ম জাতিদের কিছু আভাস বাঙালীর রক্তে, বাঙালীর দেহগঠনে আছে কি? থাকিলে কতটুকু এবং বাঙ্‌লার কোন্ কোন্ জায়গায়? আর্য ও আর্যপূর্ব জাতিদের রক্ত ও দেহগঠন বাঙালীর রক্ত ও দেহগঠনে

কতটুকু, কি পরিমাণে সহায়তা করিয়াছে? ঐতিহাসিককালে ভারতবর্ষের বাহিরের ও ভিতরের অন্যান্য প্রদেশের কোন্ কোন্ জাতির লোক বাঙ্‌লা দেশে আসিয়াছে এবং বাঙালীর রক্ত ও দেহগঠন কতখানি রূপান্তরিত করিয়াছে? বাঙ্‌লা দেশে যে-বর্ণবিভাগ দেখা যায় তাহার সঙ্গে জাতির সম্বন্ধ কতটুকু? ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ইত্যাদি বর্ণের লোকেরা কোন্ জাতি? সমাজে জলচল শূদ্রবর্ণের লোকেরা কোন্ জাতি? জল অচল নিম্নবর্ণীয় যে অসংখ্য লোক তারাই বা কোন্ জাতি? চণ্ডাল, পোদ্, বাগ্‌দী, নমঃশূদ্র, কৈবর্ত, মাল ইত্যাদিরা কোন্ জাতি? সাহা, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক ইত্যাদি বাণিজ্য ব্যবসায়ী লোকেরা কোন্ জাতি? রজক, নাপিত, কর্মকার, সূত্রধর ইত্যাদিরাই বা কে? সব প্রশ্নের উত্তর বাঙ্‌লার নৃতত্ব-গবেষণার বর্তমান অবস্থায় পাওয়া যাইবে না, তবু, যতটুকু নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহারই বলে মোটামুটি একটা কাঠামো আমি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি। বাঙালীর জাতি গঠনের এই গোড়ার কথাটা না জানিলে প্রাচীন বাঙালীর শ্রেণীবিভাগ ও বর্ণবিভাগ রাষ্ট্রের স্বরূপ, এককথায় সমাজের সম্পূর্ণ চেহারাটা ধরা পড়িবে না।

বাঙালীর ইতিহাসের দ্বিতীয় কথা বাঙ্‌লার ভূমির পরিচয় ও ভূমি-বিভাগ। বাঙ্‌লা দেশের নদনদী পাহাড় প্রান্তর বন জনপদ আশ্রয় করিয়া ঐতিহাসিক কালের পূর্বেই যে-সমস্ত বিভিন্ন জাতি একসঙ্গে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল তাহাদের বন্ধন-সূত্র ছিল পূর্বভারতের ভাগীরথী-করতোয়া-লৌহিত্য বিধৌত ভূভাগ। তাহাদের এই সুবিস্তীর্ণ ভূভাগের জল ও বায়ু এই দেশের অধিবাসীদিগকে গড়িয়াছে; ইহার ভূমির উর্বরতা কৃষিকে ধনোৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপায় করিয়া গড়িয়াছে; ইহার অসংখ্য মৎস্যবহুল নদনদী, তাহাদের শাখা ও উপনদীগুলি, অন্তর্বাণিজ্যের সাহায্য করিয়া ধনোৎপাদনের আর এক উপায় সহজ ও সুগম করিয়াছে। ইহার সমুদ্রোপকূল শুধু যে বহির্বাণিজ্যের সাহায্য করিয়াছে তাহাই নয়, দেশের কোন কোন উৎপন্ন দ্রব্যের স্বরূপও নির্ণয় করিয়াছে। তাহা ছাড়া এই দেশের প্রাচীন যে রাষ্ট্র ও জনপদ-বিভাগ তাহাও নির্ণীত হইয়াছে বাঙ্‌লার নদীগুলি দ্বারা। বাঙ্‌লার এই নদনদীগুলি, এই বন ও প্রান্তর, ইহার জলবায়ুর উষ্ণ জলীয়তা, ইহার বিধৌত নিম্নভূমিগুলি, ইহার সমুদ্রোপকূল সমস্তই এই দেশের সমাজবিন্যাসকে কমবেশী ভাবাম্বিত করিয়াছে। কাজেই বাঙ্‌লা দেশের সত্য ভৌগোলিক পরিচয়ও বাঙালীর ইতিহাসেরই কথা।

জাতি এবং দেশ হইতেছে সমাজ-রচনার ঐতিহ্য ও পরিবেশ। কিন্তু, পূর্বেই বলিয়াছি, সমাজ-সৌধের বস্তুভিত্তি হইতেছে ধন। কাজেই প্রাচীন বাঙ্‌লার

ধনসম্বল কি ছিল, ধনোৎপাদনের কি কি উপায় ছিল, কি কি ছিল উৎপন্ন বস্তু, শিল্প বাণিজ্য কৃষি ইত্যাদি কিরূপ ছিল, এই সব তথ্য বাঙালীর ইতিহাসের তৃতীয় কথা।

এইমাত্র বলিলাম, প্রাচীন বাঙ্‌লায় কৃষি ছিল ধনোৎপাদনের অন্যতম প্রধান ও প্রথম উপায়। কৃষির সঙ্গে দেশের ভূমি-ব্যবস্থা জড়িত। এই ভূমি-ব্যবস্থার উপরই দেশের অগণিত জনসাধারণের মরণ-বাঁচন নির্ভর করিত, এখনও করে। ভূমি কয়প্রকার ছিল, ভূমির উপর রাজার অধিকারের স্বরূপ কি ছিল, প্রজার অধিকারই বা কতটুকু ছিল, ভূমির মূল্য কিরূপ ছিল, মূল্য গ্রহয়িতা কে ছিলেন, ভূমি দানের প্রেরণা কি ছিল, ভূমির সীমা-নির্দেশের রীতি ও উপায় কি ছিল, রাজস্ব কিরূপ ছিল, প্রজার দায়ীত্ব কি ছিল, খাসপ্রজা, নিম্নপ্রজা ইত্যাদি ছিল কিনা, এক কথায় ভূমি-ব্যবস্থার কথা বাঙালীর ইতিহাসের চতুর্থ কথা।

কিন্তু বাঙ্‌লার জনসাধারণ সকলেই ত কিছু ক্ষেত্রকর বা কৃষক ছিল না। এখনকার মত তখনও বৃহৎ একটা চাকুরীজীবি সম্প্রদায়ও ছিল; ইহাদের প্রায় সকলেই ছিলেন রাজকর্মচারী। তাহা ছাড়া, ছোট দোকানদার হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় বণিক, সার্থবাহ, শ্রেষ্ঠী, ব্যাপারী, ইহাদের সংখ্যাও কম ছিল না। কৃষক বা ক্ষেত্রকররা ত ছিলই। তাহা ছাড়া শিক্ষকতা, পৌরোহিত্য, দেবপূজা, নীতিপাঠ ইত্যাদি বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণেরাও ছিল। সকলের শেষে সমাজের নিম্নতম স্তরের চণ্ডাল পর্যন্ত অন্যান্য অকীর্তিত অগণিত লোকও ছিল। প্রাচীন বাঙালী সমাজ এইসব নানা শ্রেণীতে বিন্যস্ত ছিল। এইসব বিভিন্ন শ্রেণীর বৃত্তি, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ, তাহাদের দায় ও কর্তব্য, তাহাদের দায়ীত্ব ও অধিকার, ইত্যাদি সম্বন্ধে যে স্বল্প কথা জানা যায়, তাহাই বাঙালীর ইতিহাসের পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রেণীবিভাগের পরই আসিয়া পড়ে বর্ণবিভাগের কথা। বাঙ্‌লা দেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই, অল্পসংখ্যক থাকিলেও তাহাদের কোন প্রাধান্য নাই। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র এবং নিম্নবর্ণীয় যে-সব বর্ণের লোকেদের কথা প্রাচীন লেখমালায় ও গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ, প্রত্যেকের স্বরূপ কি, বৃত্তি কি? বর্ণের সঙ্গে শ্রেণীর কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা, সমাজে ও রাষ্ট্রে বিভিন্ন বর্ণের স্থান কি ইত্যাদি সকল কথাই বাঙালীর ইতিহাসের কথা, এবং এই কথা বাঙালীর ইতিহাসের ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর অগণিত জনসাধারণ বাস করিত হয় গ্রামে না হয় নগরে; এখনকার মত তখনও হয়ত তার চেয়েও বেশী লোক গ্রামেই বাস করিত।

এক একটা গ্রাম কি করিয়া গড়িয়া উঠিত তাহার ২।১টি প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রামের সংস্থান কিরূপ ছিল, নগরের সংস্থান কিরূপ ছিল? গ্রামের শাসন-যন্ত্র কিছু ছিল কি? নগরের রূপ কি ছিল? গ্রাম ও নগর, এই দুইয়ের সভ্যতার রূপ কি ছিল? বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির চেহারা কিরূপ ছিল? সমস্ত প্রশ্নের উত্তর মিলিবে না, তবু যতটুকু জানা যায় ততটুকু জানাই প্রাচীন বাঙ্‌লা দেশ ও বাঙালীকে জানা। এই জানার চেষ্টায় আমাদের বাঙালীর ইতিহাসের সপ্তম অধ্যায়।

কিন্তু, এই যে বিভিন্ন শ্রেণী ও বর্ণের বিচিত্র জনসাধারণ, ইহাদের দৈনন্দিন জীবনের যে বিচিত্র কর্ম, বিচিত্র দায় ও দায়ীত্ব, তাহা ইহারা নির্বিবাদে পরস্পরের স্বার্থের সংঘাত বাঁচাইয়া নির্বাহ করিবে কি করিয়া? ক্ষেত্রকর যে হল-চালনা করিতে গিয়া নিজের জমির সীমা ডিঙাইয়া প্রতিবেশীর জমি লোভ করিবে না, তাহা দেখিবে কে? যে-বণিক পুণ্ড্র অথবা চম্পাপুরী হইতে তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত গরুর গাড়ীর লহরে অথবা নদীপথে সপ্তডিঙ্গায় পণ্য সাজাইয়া চলিয়াছে, পথে দস্যু তাহাকে হত্যা করিয়া পণ্য লুটিয়া লইবে না, এই বিশ্বাস তাহাকে দিবে কে? প্রত্যেকে স্বধর্মে ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আপনাপন রুচি ও কর্তব্যানুযায়ী জীবন যাপন করিয়া যাইতে পারিবে, এই আশ্বাস সমাজ দিতে না পারিলে সমাজ-বিন্যাস সম্ভব হইতে পারে না। এই আশ্বাস দিবার, প্রত্যেককে স্বধর্মে ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার যন্ত্র হইতেছে রাষ্ট্র, এবং সমাজ নিজের প্রয়োজনেই এই রাষ্ট্রযন্ত্রের সৃষ্টি করে, এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রধান পরিচালককে রাজা বলিয়া স্বীকার করে, তাহার বা রাজপুরুষদের ও রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ম মানিয়া চলে, রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালনার ব্যয় নির্বাহ করে, রাজাকে নিজেদের শ্রদ্ধা দান করে, এবং তাহার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বপ্রকার বাধ্যতা স্বীকার করে। ইহাই মহাভারতের শান্তিপর্ব বর্ণিত রাজধর্ম, অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপের social contract theory। প্রাচীন বাঙ্‌লায় এই রাজা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বরূপ কি ছিল? রাষ্ট্রপ্রধান কাহারা ছিলেন, রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা কাহারা করিতেন? রাষ্ট্রের আয় ব্যয় কি ছিল? রাজস্ব কি কি ছিল, কিরূপ ছিল? রাষ্ট্রে কোন্ কোন্ শ্রেণী ও বর্ণের আধিপত্য ছিল? ধনোৎপাদনে ও বণ্টনে রাষ্ট্রের আধিপত্য কতটুকু ছিল? রাষ্ট্রাদর্শ কি ছিল? রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের ও সামাজিক সংস্কৃতি যোগ কিরূপ ছিল? এইসব বিচিত্র প্রশ্নের উত্তর লইয়া বাঙালীর ইতিহাসের অষ্টম অধ্যায়।

সর্বশেষে আসিতেছে প্রাচীন বাঙালীর সংস্কৃতির কথা। সংস্কৃতির প্রয়োজন কি? মানুষ ত শুধু খাইয়া পরিয়া দেহগত জীবনধারণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে না।

তাহার একটা মানসগত জীবনও আছে। এই মানসগত জীবন সকল মানুষের সমান নয়। যে শ্রেণী অথবা সমাজের সামাজিক মন সহৃদয় যত বেশী সেই শ্রেণী ও সমাজের মানসজীবন তত উন্নত। এই মানসজীবনের প্রকাশই সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি সকল শ্রেণী ও বর্ণের লোকদের এক নয়, এক হইতে পারে না। সংস্কৃতির মূলে আছে কায়িকশ্রম হইতে অবসর; শ্রেণী ও বর্ণের সামাজিক ধন সঞ্চয় বা উদ্বৃত্ত ধন বেশী তাহারাই সেই ধনের বলে শ্রেণী ও বর্ণের কতকগুলি লোককে ধনোৎপাদন জাত কায়িক শ্রম হইতে মুক্তি দিয়া অবসরের সুযোগ দিতে পারে। সেই সুযোগে তাহারা চিন্তা, অধ্যয়ন, শিল্প ও সাহিত্য-চর্চা ইত্যাদি করিতে পারে, এবং তাহারা তাহাদের শ্রেণীগত, বর্ণগত, নিজস্ব সমাজ অংশগত মানসের চিন্তা কল্পনা, ভাব ও অনুভবকে রূপদান করিতে পারে। প্রাচীন বাঙ্‌লায়ও তাহাই হইয়াছিল। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। যাহাই হউক, প্রাচীন বাঙ্‌লায় সংস্কৃতির রূপ আমরা দেখিতে পাই ধর্মের ক্ষেত্রে, শিল্পে ও নৃত্যগীতে, সাহিত্যে, ব্যবহারিক অনুশাসন, সামাজিক অনুশাসন ইত্যাদিতে। এই সংস্কৃতির অর্দ্ধেক পুরাতন ঐতিহ্য-জাত; এই ঐতিহ্যের মধ্যে থাকে জাতিগত, বর্ণগত রক্তের স্মৃতি, থাকে পূর্বপুরুষদের সংস্কৃতির স্মৃতি; বাকী অর্দ্ধেক সমসাময়িক সমাজ-বিন্যাসের প্রয়োজনে গড়িয়া উঠে। কাজেই অতীতের স্মৃতিও বর্তমানের প্রয়োজন, এই দুই বস্তুই বিশেষ দেশ ও বিশেষ কালের সংস্কৃতির মধ্যে জড়াজড়ি করিয়া থাকে। প্রাচীন বাঙ্‌লায়ও তাহাই হইয়াছিল, এবং প্রাকৃতিক নিয়মের বশেই হইয়াছিল। প্রাচীন বাঙ্‌লার এই সংস্কৃতির স্বরূপটা কি, সত্যকার চেহারাটা কি তাহা জানিবার প্রয়াস লইয়াই আমার বাঙালীর ইতিহাসের শেষ অধ্যায়। সুস্পষ্ট স্বরূপ হয়ত জানা যাইবে না, জানিবার উপাদানও এ-যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই; তবু চেষ্টা করিতে দোষ নাই, মোটামুটি আভাস একটু পাওয়া যাইবে ত!

আমি কোন নূতন শিলা অথবা তাম্রপট্টের সন্ধান পাই নাই, কোন প্রাচীন গ্রন্থের খবর নূতন করিয়া জানি নাই, কোনও নূতন উপাদান আবিষ্কার করি নাই। যে-সমস্ত প্রাচীন লেখমালা বা গ্রন্থ সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়াছে, যে-সমস্ত উপাদান পণ্ডিতমহলে অত্যন্ত সুপরিচিত এবং বহু আলোচিত তাহা হইতেই আমি সমস্ত তথ্য ও উপকরণ আহরণ করিয়াছি। কাজেই পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের সকলের কাছেই আমি ঋণী। আমার এই ঋণ গোপন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এই সমস্ত উপাদান ও পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের রচনা আমার সম্মুখে বর্তমান না থাকিলে এই প্রয়াস অসম্ভব হইত। আমি শুধু প্রাচীন বাঙ্‌লার ও প্রাচীন বাঙালীর

ইতিহাস একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর দিয়া বাঙালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করিতেছি মাত্র, এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজবিজ্ঞান-সম্মত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি বলিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বিশ্বাস করেন, আমিও করি।

তাহা ছাড়া, এই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আমি প্রাচীন বাঙ্‌লার সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার প্রয়াসও করিতেছি না; সে-সময় এখনও আসে নাই বলিয়াই মনে হয়। উপাদান অত্যন্ত অল্প এবং এই উপাদানলব্ধ সংবাদ অল্পতর। আমি শুধু কাঠামো রচনার প্রয়াস করিয়াছি, ভবিষ্যৎ বাঙালী ঐতিহাসিকেরা ইহাতে রক্তমাংস যোজনা করিবেন এই আশা ও বিশ্বাসে। আরও একটু আশা, এই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বর্তমান সমাজবিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে তাহারা বাঙ্‌লার মধ্যযুগ ও বর্তমানযুগের ইতিহাসও ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিবেন।

আমার কোন কথাই শেষ কথা নহে; সত্যসন্ধী ঐতিহাসিকের কাছে শেষ কথা কিছু নাই; তাহার সব কথাই experiments with truth মাত্র। এই কাঠামো রচনার প্রয়াস সত্যে পৌঁছিবার নিয়তম স্তর। এই স্তর যদি ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিককে সত্যে পৌঁছিতে কিছুমাত্র সহায়তা করে, তবেই আমার ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ সার্থক বিবেচনা করিব। *

---

* এই প্রবন্ধ লেখকের "বাঙালীর ইতিহাসের কাঠামো" নামক গ্রন্থের ভূমিকা, এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদে অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালায় প্রদত্ত বক্তৃতার প্রথমাংশ। সম্পূর্ণ গ্রন্থ এখন রচনাধীন। —"চতুরঙ্গ" সম্পাদক।

মালী

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভুবন পিয়নের ছেলে মনোহর ছেলেবেলা হইতেই ফুলের বাগান ভালবাসিতে শিখিল। মালিকের ভাসা ভাসা ভালবাসা নয়, মালীর মাটি খুঁড়িয়া শিকড়-কামড়ানো প্রেম।

ভুবন পিয়নের বাড়ীর কাছেই একজন রায়বাহাদুরের মস্ত বাগান, ফুল আর লতাপাতার গন্ধ ও রূপে ঠাসা। পনের বছর বয়সেই বাগানের মালীর কাজে সাহায্য করিয়া মনোহর মাসে ছ'টাকা করিয়া উপার্জ্জন করিতে লাগিল। টাকাটা না পাইলে ভুবন তাকে এ কাজে লাগিতে দিত কিনা সন্দেহ।

বাইশ বছর বয়সে স্থানীয় কালেক্টরের বাংলো-ঘেরা বাগানে সহকারী মালীর পদটা মনোহরের জুটিয়া গেল। বেতন যে তার অনেক বাড়িয়া গেল তা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া, কালেক্টরের স্ত্রী মিসেস লায়ইন নতুন ছোকরা মালীটিকে এত বেশী পছন্দ করিয়া ফেলিল যে তাড়াতাড়ি বেতনবৃদ্ধি আর পদোন্নতির সম্ভাবনায়ও কারও সন্দেহ রহিল না।

সেই সঙ্গে বাড়িল সম্মান—এবং গর্ব্ব। উর্দ্দি আঁটিয়া যে বাড়ী বাড়ী চিঠি বিলি করিয়া বেড়ায় তার ছেলেকে সঙ্গে করিয়া প্রায়ই বাগানে হাঁটিতে দেখা যায় সেই নারীকে যে শুধু মেমসায়েব নয়, সহরে যার স্থান আর সমস্ত নারীর উর্দ্ধে—একি সহজ সম্মান ও গর্ব্বের কথা!

সহরের লাল ধূলিভরা পথে হাঁটিতে হাঁটিতে উর্দ্দির নীচে ভুবনের শরীর ঘামে ভিজিয়া ওঠে, তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া যায়, কিন্তু মনে তার উত্তেজনার সীমা থাকে না। পরিচিত অপরিচিত সকলের কাছে সুযোগ পাইলেই সে বলিয়া বেড়ায় মিসেস লায়ইন তার ছেলেকে কত ভালবাসে। মাঝে মাঝে প্রমাণও দাখিল করে।

'পর্শু সকালে জ্বর হয়েছিল বলে কাজে যায়নি তো, বললে না পেত্যয় যাবে দাদা, একটু বেলা হতেই মেমসায়েব নিজে খোঁজ নিতে লোক পাঠিয়ে দেছে। সে এক কাণ্ড আর কি!...

ভুবনের বৌ রোজই প্রায় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে, 'আজ কি বল্‌লো রে মেমসায়েব?'

মনোহরও সাগ্রহে, সগর্ব্বে বিস্তারিত বিবরণ বলিয়া যায়। কেবল মা'র কাছে নয়, যে শোনে তারই কাছে। ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া এবং বানাইয়াও এত কিছু বলে যে সব কথা কাণে গেলে লায়ইন সাহেবের হয় তো সন্দেহই জাগিয়া যাইত, বিশ বাইশ বছর আগে কোর্টিং-এর সময় যেমন করিত এতদিন পরে মিসেস লায়ইন বুঝি সহকারী মালীটার সঙ্গে আবার তারই পুনরাভিনয় আরম্ভ করিয়াছে।

আসলে মিসেস লায়ইন হয়তো বাগানে আসিয়া ডাকে, 'মালী-ই-ই···!'

প্রধান মালী বৃন্দাবন সামনে গিয়া বলে, 'হুজুর!'

মিসেস লায়ইন একটা ফুলগাছ দেখাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করে, ফুল ফোটে নাই কেন? বৃন্দাবন বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করে যে বছরের এক এক সময়ে এক একটা গাছে ফুল ফোটে, সব সময় ফোটে না।

'বজ্জাত! উল্লু! তুম কুছ জানতা নাই?

মনোহর কাছেই থাকে, তখন ডাক পড়ে তার। মেমসায়েব যা বলে তাই সে স্বীকার করিয়া নেয়, কিছুই বুঝাইবার চেষ্টা করে না। বেশী করিয়া জল আর সার দিলে ফুল ফুটিবে না? নিশ্চয় ফুটিবে। যে সাল্‌ফর নামও কোনদিন শোনে নাই, আজই সে সার আনিয়া গাছের গোড়ায় দিবে।

তিন চারটা কুঁকড়ানো কুঁড়ি পাতার আড়ালে লুকাইয়া আছে মনোহর আগেই দেখিয়াছিল, খুঁজিয়া খুঁজিয়া আরও গোটা দুই আবিষ্কার করা যায়। তিন দিন পরে মিসেস লায়ইনকে সে শীর্ণ ফুল কয়েকটি এবং দু'টি নতুন কুঁড়ি দেখাইয়া দেয়। মিসেস লায়ইনের অবশ্য কোন কথাই মনে ছিল না, কোন দিন থাকেও না। সেই গাছটিতে ফুল ফোটে না কেন তাই নিয়া কোন দিনই হয়তো আর সে গোলমাল করিত না। মনোহর মনে পড়াইয়া দেওয়ায় তার উৎসাহ আর অধ্যবসায় দেখিয়া খুসী হইয়া তাকে একটা টাকাই বখশীশ দিয়া ফেলে।

খানিক তফাতে বেড়ার পাতা ছাঁটা বন্ধ করিয়া বৃন্দাবন হাঁ করিয়া চাহিয়া ছিল প্রথম হইতেই, হাঁ বন্ধ হইয়া তার দাঁত কড়কড় করিতে থাকে।

নতুন চকচকে টাকা। মনোহর একবার হাতের তালুতে টাকার দিকে, একবার চকচকে পোষাক পরা মিসেস লায়ইনের দিকে, একবার চকচকে

বাগানের দিকে তাকায়। এখানে চারিদিকেই চাকচিক্য। কি বিচিত্র রঙ ফুলে আর পাতাবাহারের পাতায়! মিসেস লায়ইনের গালে আর ঠোঁটে পর্য্যন্ত রঙ। জগতে যে এত রং আর রূপ আছে এখানে কাজ করিতে আসিবার আগে মনোহর তা কল্পনাও করিতে পারিত না।

সাজানোই বা কি নিখুঁত, একটি যেন ছবি আঁকা হইয়া আছে, বাতাসের দোলনেও চিরন্তন সামঞ্জস্যের পরিবর্ত্তন ঘটে না। একটি চারা স্থানভ্রষ্ট নয়, একটি শীষ বিপথগামী নয়, ঝাপছাড়া একটি ফুল ফোটে না, পাতা গজায় না। লনের চারিদিকে সবুজ লাইন এমন কৌশলে ছাঁটা যে দেখিলে মনে হয় নিবিড় ঘাসে ঢাকা লনটাই যেন সীমানায় পৌঁছিয়া ঢেউয়ের মত উথলাইয়া উঠিয়াছে।

মিসেস লায়ইনকেই বা এ বাগানে কি চমৎকার মানায়। এক ঝাঁক রঙীন প্রজাপতির মত ফুলে ছাওয়া ছোট একটি চারকোণা প্লটের ধারে মিসেস লায়ইনকে মনে হইতেছে যেন প্রকাণ্ড একটা জীবন্ত ফুল। ভাগ্যে এখানে কাজটা সে পাইয়াছিল! এরকম বাগান মনোহরের স্বর্গেও বোধ হয় নাই। রায়বাহাদুরের বাগান শুধু ফুলের চারায় ঠাসা—যেখান সেখানে যেভাবে খুসী রোপন করা হইয়াছে, নিয়ম নাই, হিসাব নাই, বাছাবাছি নাই। মানুষ সেখানে কাজ করিতে পারে?

তবু মুগ্ধ ও উত্তেজিত মনোহরের মনটা খুঁত খুঁত করিতে থাকে। সব আছে কিন্তু কি যেন এখানে নাই। কি যেন থাকা উচিত ছিল, কিসের একটা অভাবের জন্য সে যেন এখানে ফাঁকিতে পড়িয়া গিয়াছে। খাইয়া পেট না ভরার মত মৃদু একটা অস্বস্তি মনোহরকে পীড়ন করিতে থাকে। অস্বাভাবিক উৎসাহের সঙ্গে সে বাগানে কাজ আরম্ভ করিয়া দেয়। মিসেস লায়ইন চলিয়া যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে বাগানের দক্ষিণ সীমানায় এক ঝাঁক আজালি চারার কাছে হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়ে। কয়েকবার জোরে জোরে শ্বাস টানিয়া ব্যগ্র দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে থাকে। একপাশে কয়েকটি অনাদৃত রজনীগন্ধা ফুটিয়াছে।

এখানে রজনীগন্ধা ফুটিতে দেওয়া উচিত হয় নাই, বাগানের শৃঙ্খলা নষ্ট করা হইয়াছে। এটা তার নিজেরই কীর্ত্তি, কয়েক দিন আগে নিজেই সে খেয়ালের বশে এ ফুল ফুটিবার সূত্রপাত করিয়া রাখিয়াছিল।

তুলিয়া ফেলিবে?

ভ্রু কুঁচকাইয়া মনোহর এই গুরুতর প্রশ্নের জবাব খুঁজিতেছে, বৃন্দাবন আসিয়া তার দাবী জানায়, 'মতে ভাগ দিঅ!'

বৃন্দাবন সুপিরিয়র অফিসার, বখশীশে ভাগ বসাইবার অধিকার তার আছে। মনোহরের কাছে খুচরা পয়সা ছিল না, বৃন্দাবনের কাছে ভাঙ্গানি থাকিলেও চকচকে টাকাটি ভাঙ্গাইতে মনোহর কিছুতেই রাজী হয় না। বৃন্দাবন তাকে গাল দিতে আরম্ভ করে—সঙ্গে সঙ্গে বখশীশের ভাগ না পাওয়ার জন্যই কেবল নয়।

সেদিন বাড়ীতে মনোহর বিবরণ দেয়: মেমসায়েব কি বললো জানো, বললো, আমার মত কাজ কেউ জানে না। রোদে কাজ করে করে ঘেমে গেছি দেখে নিজে আমায় ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে সরবৎ খেতে দিল। কি মিষ্টি সরবৎ! কি গন্ধ সরবতে!'

বখশীশের কথাটা মনোহর উল্লেখ করে না। ভুবন জানিতে পারিলে টাকাটা কাড়িয়া নিবে।

ভুবন শত্রু ও মিত্রের কাছে বিবরণ দেয়: কি চোখেই যে ছেলেটাকে দেখেছে মেমসায়েব। বললে না পেত্যয় যাবে, আজকে ঘরে নিয়ে কাছে বসিয়ে খাইয়েছে। ফল আর মিষ্টি আর সরবৎ খাইয়েছে, অন্য কিছু নয়।···

ভোরে মনোহর কাজে যায়, দুপুরবেলা ভাত খাইতে বাড়ী আসে। আবার বিকালে কাজে গিয়ে সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসে। সব মাটির শরীর এক দিন মাটিতে মিশিয়া যায় সত্য কিন্তু আপাততঃ মাটি ঘাঁটিয়া মনোহরের দেহে অপূর্ব্ব শ্রী দেখা দিতে থাকে। রায়বাহাদুরের বাগানে কাজ আরম্ভ করার আগে সে ছিল শুষ্ক শীর্ণ আর নোংরা, কয়েক বছরে তার এমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে যেন তার দেহের বাগানে তারই মত একজন উৎসাহী মালী কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। রায়বাহাদুরের বাগানে কাজ করার সময়েও সে ছেঁড়া ময়লা কাপড় আর খাকী হাফ সার্ট পরিত, এখন সে সর্ব্বদাই রীতিমত বাবু সাজিয়া থাকে। মিসেস লায়ইন চাকর বাকরের অপরিচ্ছন্নতা চু'চোখে দেখিতে পারে না।

কাজে যাওয়ার জন্য মনোহর ছটফট করিতে থাকে, বাড়ীতে তার ভাল লাগে না। বাগানের বাহিরে আসিলেই তার ভিতরের মৃদু অভাব বোধ উপিয়া যায়, শুধু থাকে বাগানের আকর্ষণ। গেটের বাহিরে পা দিয়াই সে ভাবিতে আরম্ভ করে, কতক্ষণে আবার ফিরিয়া আসিবে।

মাস ছয়েক সে একরকম পৃথিবীই ভুলিয়া থাকে, কোন দিকে মন দেওয়ার অবসর পায় না। গোবরার তাসের আড্ডায় যদি বা যায় শুধু গল্প করে মিসেস লায়ইন আর তার বাগানের। এত যে সে ভালবাসিত রায়বাহাদুরের

বাগান, দু'ঘণ্টার কাজের জন্য নামমাত্র বেতন পাইয়া সারাদিন সেখানে পড়িয়া থাকিত, ছ'মাসের মধ্যে একবার সে বাগানে উঁকি দেওয়ার সুযোগও তার হয় না।

হেমন্তের এক অপরাহ্নে মনোহরকে একবার রায়বাহাদুরের বাড়ী যাইতে হইল। পরিষ্কার সাজ পোষাক বজায় রাখা তার একটা মস্ত সমস্যা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সহকারী ছোকরা মালী আর কত বেতন পায়, মাঝে মাঝে চকচকে একটা টাকা বখশীশ পাইলেই বা কত জামা কাপড় কেনা যায়। রায়বাহাদুরের ছেলে অনেক, জামা কাপড় তাদের অফুরন্ত, ছিঁড়িয়া অব্যবহার্য্য হওয়ার অনেক আগেই জামা কাপড় তারা ত্যাগ করে। আগে অনেকবার মনোহর অনেক জামা কাপড় বখশীশ পাইয়াছে, সকলে তাকে যেরকম স্নেহ করিত এখন গিয়া চাহিলে কি আর কয়েকটা পাওয়া যাইবে না?

বাগানের সামনে চুণবালি খসা ইঁট বাহির করা পুরাণো প্রাচীর। মিসেস লায়ইনের বাগানের বহিঃপ্রাচীর দেখিতে অভ্যস্ত চোখে এ প্রাচীর দেখিয়াই মনোহরের মনে অবজ্ঞা জাগা উচিত ছিল। কিন্তু কাছাকাছি আসিয়া হঠাৎ সে অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া পড়িল, ক্লোরোফর্ম্মের ঝাপটা লাগিয়া চেতনা যেন তার অবশ হইয়া আসিয়াছে। বাতাস বহিতেছে অতি মৃদু, ভাল করিয়া অনুভবও করা যায় না, কিন্তু নানা ফুলের যে মিশ্রিত গাঢ় গন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে তা যেন স্পর্শ করা যায়।

মরিচা ধরা লোহার গেট ঠেলিয়া মনোহর ভিতরে গেল, গেট খুলিতে আর বন্ধ করিতে যে তীক্ষ্ণ আওয়াজ উঠিল সেটা তার কাণে গেল কিনা সন্দেহ। বাগানের মধ্যে ফুলের গন্ধ আরও বেশী ঘন, আরও বেশী মোহকর। দম যেন আটকাইয়া আসিতে চায়। চারিদিকে এলোমেলো ভাবে রাশি রাশি ফুল ফুটিয়া আছে, সাধারণ চেনা সুগন্ধি ফুল। কয়েক মাসের অযত্ন আর অবহেলার চিহ্ন চারিদিকে স্পষ্ট চোখে পড়ে, গোড়ায় জল দেওয়া আর ঝরাপাতা জমিলে ঝাঁটাইয়া ফেলা ছাড়া বাগানের দিকে এতকাল কেউ বিশেষ নজর দিয়াছে কিনা সন্দেহ। চারিদিকে কত যে আগাছা মাথা উঁচু করিয়াছে! গাছগুলির কোনটা বড়, কোনটা ছোট, কোনটা জমকালো, কোনটা শীর্ণ,—ডালপাতা সব এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। কিন্তু তাতে ফুল ফুটিবার বাধা হয় নাই।

মনোহর বাগানের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, রায়বাহাদুরের গিন্নী তিন মেয়ে, এক বৌ আর দুই ভাগ্নীকে সঙ্গে নিয়া পাড়ায় বেড়াইতে যাওয়ার

জন্য বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সঙ্গে গুটী সাতেক ছোটবড় ছেলে মেয়ে। মনোহরকে দেখিয়া বৌটি ছাড়া সকলেই সমস্বরে বলিল, 'কেরে, মনোহর!'

সলজ্জ হাসিতে মুখ ভরিয়া মনোহর বলিল, 'আজ্ঞে।'

বৌটি ছাড়া সকলের পরণেই ভিন্ন ভিন্ন রঙের একরঙা শাড়ী, বৌটির শাড়ী রামধনু রঙের। ছেলেমেয়েদের ফ্রকগুলির রঙও কম বিচিত্র নয়। গন্ধের নেশায় আত্মহারা মনোহরের মধ্যে এতক্ষণের মৃদু একটা অসন্তোষের ভাব দূর করিবার জন্যই নানা আকারের এতগুলি জীবন্ত রঙীন ফুল যেন সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

রায়বাহাদুরের গিন্নী বলিল, 'না বলে কয়ে হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিলি যে বড়?'

মনোহর আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'আপনারা রাখলেন না তো কি করি।'

রায়বাহাদুরের গিন্নী বলিল, 'রাখলাম না! কবে আবার রাখলাম না তোকে, নেমকহারাম বজ্জাৎ?' রায়বাহাদুরের মোটাসোটা গিন্নী হাসিমুখে গালাগালি দিয়াই চাকরবাকরের সঙ্গে কথা বলে।

বড় মেয়ে বলিল, 'তুই নাকি লায়ইন সায়েবের বাড়ীতে কাজ করিস?'

মেজ মেয়ে বলিল, 'ভাল কয়েকটা বিলিতী ফুলের চারা এনে দেনা আমাদের? দিবি?'

ছোট মেয়ে বলিল, 'আমাদের কাজ তো ছেড়ে দিলি, সায়েব যখন দু'দিন পরে বদলী হয়ে যাবে, তখন তুই করবি কিরে মনোহর?

বৌটি ফিসফিস করিয়া বলিল, 'সায়েব বুঝি বাংলো সঙ্গে নিয়ে যাবে ঠাকুরঝি?'

রায়বাহাদুরের গিন্নী বলিল, 'তুমি চুপ কর বৌমা, সব কথায় তোমার কথা কওয়া কেন? তুই ক'টাকা মাইনে পাস রে মনোহর?'

মনোহর বলিল, 'আজ্ঞে, পনের টাকা।'

রায়বাহাদুরের গিন্নী বলিল, 'ও বাবা! সাত আট টাকা মাইনে দিলে কত গণ্ডা গণ্ডা মালী পাওয়া যায়—পনের টাকা!'

বৌটি ফিস ফিস করিয়া বলিল, 'খেতে পরতে তো দেয় না।'

রায়বাহাদুরের গিন্নী বলিল, 'আঃ, তুমি চুপ কর না বৌমা!—তুই কি চাস্?'

মনোহর বলিল, 'আজ্ঞে এমনি দেখা করতে এসেছি।'

রায়বাহাদুরের গিন্নী বলিল, 'তা বেশ করেছিস। তা ছাখ্, সাত টাকায় যদি থাকিস তো তোকে রাখতে পারি। এক বেলা খাওয়া পাবি। থাকবি?'

মনোহর চিন্তা করিল না, কারণ চিন্তা করিবার ক্ষমতা তার ছিল না। প্রত্যেকটি নিশ্বাসে গন্ধের প্রতীক হইয়া তার অতীত জীবন তার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, তার সমস্ত মানসিক শক্তি আত্মসমর্পণ করিয়াছে এই একটিমাত্র গন্ধরূপী মোহের প্রভাবে। চোখ বুজিয়া মনোহর বলিল, 'আজ্ঞে, থাকব।'

রায়বাহাদুরের গিন্নী বলিল, 'আচ্ছা, কাল থেকে আসিস তা হ'লে। বিলিতী ফুলগাছ আনিস কিন্তু—যটা পারিস।'

বৌটি ফিস ফিস্ করিয়া বলিল, 'কাল কাজ ছেড়ে এলে তো এমাসের মাইনে পাবে না।'

রায়বাহাদুরের গিন্নী বলিল, 'বৌমা! চুপ কর। কাল সকাল থেকে আসবি তো?'

মনোহর বলিল, 'আসব।'

আচ্ছন্নের মত মিসেস লায়ইনের বাগানে ঘুরিতে ঘুরিতে মনোহর ভাবিতে থাকে, আজই মেমসায়েবের কাছে বিদায় নিতে হইবে। এ বাগানে কাজ করিবার এতটুকু আগ্রহও আর মনোহরের নাই। রায়বাহাদুরের বাগানে যাওয়ার জন্য তার মনটা ছটফট করিতেছে। এ বাগানে মানুষ কাজ করে! বাগানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া চোখ বুজিলে আর টের পাওয়া যায় না যে এখানে বাগান আছে। নিজের মনে এখানে কিছু করিবার উপায় নাই, কলের মত শুধু খাটিয়া যাওয়া। এ যেন জেলখানার বাগানে জেলের কয়েদীর কাজ করা। রায়বাহাদুরের বাগানে সে যা খুসী করিতে পারিবে। কেউ প্রশ্ন করিবে না, বাধা দিবে না, দিন দিন বাগানের উন্নতি দেখিয়া শুধু খুসী হইবে। প্রতিদিন বাছিয়া বাছিয়া সে ফুল তুলিয়া দিবে, রায়বাহাদুরের বৌ আর মেয়েরা সেই ফুলে গাঁথিবে মালা। ছবির মত করিয়াই সে এবার রায়বাহাদুরের বাগানটি সাজাইবে—শুধু সুগন্ধি ফুলের গাছে। আরও রাশি রাশি ফুল ফুটাইবে। কাছে গিয়া চোখ মেলিয়া দেখিতে

হইবে না, অনেক দূর হইতেই লোকে টের পাইয়া যাইবে, কাছাকাছি ফুলের বাগান আছে।

'কাল থেকে কাজে আসব না, বৃন্দাবন।'

বৃন্দাবন বিশ্বাস করিল না,—'হুঁঃ।'

মিসেস লায়ইন আর আসেই না। শেষ বেলার সোনালী রোদ বাগানে আসিয়া পড়িয়াছে। রোদের তেজ কমিয়া আসার সঙ্গে বাগানের রঙ যেন আরও উজ্জ্বল, আরও বৈচিত্র্যময় হইয়া উঠিতে থাকে। বোকার মত দাঁড়াইয়া মনোহর মাথা নাড়ে, নিজের মনে বলে, না, এত রঙ ভাল নয়।

সূর্য্যাস্তের পর বাগানে নামিয়া আসিয়া মিসেস লায়ইন ডাকিল, 'মালী-ই-ই···'

মনোহর কাছে আগাইয়া গেল। বুকের মধ্যে তার টিপ্ টিপ্ করিতেছে। কি করিয়া বলিবে, সে আর কাজে আসিবে না! মিসেস লায়ইন যদি রাগ করে, যদি গালাগালি দিতে আরম্ভ করে? যদি তাকে পুলিশে ধরাইয়া দেয়?

মনোহরের আগেই বৃন্দাবন কাছে গিয়া দাঁড়াইল, মিসেস লায়ইন বলিল, 'বজ্জাত! উল্লু! বোলাতা শুন্তা নেই? টেবিলমে বড়া বড়া লাল গোলাপ দেও—গন্ধবালা।'

বৃন্দাবন বলিল, 'হুজুর।'

বৃন্দাবন চলিয়া গেলে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় মনোহর মিসেস লায়ইনের আরও কাছে আগাইয়া গেল। এত কাছে যাওয়ার সাহস তার আগে কোনদিন হয় নাই।

'হুজুর—'

করুণ সুরে বিদায় বাণী আরম্ভ করিতে গিয়া মনোহর থামিয়া গেল। কিসের গন্ধ নাকে লাগিতেছে? এমন মৃদু, এমন মধুর, এমন এই-আছে এই-নাই-আপছাড়া আশ্চর্য্য গন্ধ? কোন ফুলের এরকম গন্ধ আছে বলিয়া তো তার জানা নাই। নানা ফুলের মিশ্রিত গন্ধও এরকম হয় না। এতকাল সে ফুল ঘাঁটিতেছে, ফুলের গন্ধই এরকম হয় না।

বুক ভরিয়া মনোহর বাতাস গ্রহণ করে, কিন্তু জোরে শ্বাস টানিতে গিয়া গন্ধ পায় না। এরকম জোর জবরদস্তির সঙ্গে সহযোগিতা করিবার মত গন্ধ এটা নয়। সাধারণভাবে মৃদু মৃদু শ্বাস গ্রহণের মধ্যেই এ গন্ধ নিজেকে ধরা দেয়।

মিসেস লায়ইন বিরক্ত হইয়া বলিল, 'কিয়া মাংতা?'

মনোহর বলিল, 'হুজুর, বাগানমে গন্ধবালা ফুল বড় কমতি আছে।'

মিসেস লায়ইন বলিল, 'কাহে কমতি আছে? গন্ধবালা ফুল লাগাতা নাই কাহে?'

মিসেস লায়ইনের দিকে আরও একটু ঝুঁকিয়া অদ্ভুত মাদকতাভরা অচেনা মিহি সুবাস আরও একটু স্পষ্টভাবে অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়া মনোহর সাগ্রহে বলিল, 'লাগায়গা হুজুর?'

মিসেস লায়ইন বলিল, 'আলবৎ লাগায়গা। বজ্জাৎ! উল্লু!'

ফিরিবার সময় মিসেস লায়ইনের বাগান হইতে মনোহর কয়েকটি চারা চুরি করিয়া নিয়া গেল। কাজ করিবে না শুনিয়া রায়বাহাদুরের গিন্নী চটিয়া যাইবে। চারাগুলি পাইলে একটু খুসী হইতে পারে। তাছাড়া নিজের জন্য কিছু পুরাণো জামাকাপড় আর মিসেস লায়ইনের জন্য রায়বাহাদুরের বাগানের কয়েকটা চারাও তাকে সংগ্রহ করিতে হইবে।

কোন বাড়ীর মেয়েরা বেড়াইতে আসিয়াছিল, ঘেরা বারান্দায় মাদুর আর পাটি পাতিয়া রায়বাহাদুরের গিন্নী সকলকে বসাইয়াছে, বাড়ীর বৌ আর মেয়েরাও সকলে উপস্থিত আছে। ভিতরে ঢুকিবার আগেই মনোহর একটা অজানা জোরালো গন্ধ অনুভব করিতেছিল, সঙ্কুচিত পদে এক পা ভিতরে দিয়াই তীব্র গন্ধে সে অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বাগান পার হইয়া সে ভিতরে আসিয়াছে, বাগানের গন্ধের সঙ্গে এখানকার গন্ধের কোন মিল নাই। ফুলের গন্ধ এরকম হয় না।

রায়বাহাদুরের গিন্নী বলিল, 'গট গট করে বাড়ীর মধ্যে ঢুক্‌লি যে বড়? তোর কি কাণ্ডজ্ঞান নেই?'

বৌটি ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, 'ওতো বাড়ীর মধ্যে ঢোকেই।'

রায়বাহাদুরের গিন্নী বলিল, 'তুমি চুপ কর বৌমা। শোন বলি মনোহর, তোকে আমরা রাখতে পারবনা বাপু। কর্ত্তা বারণ করে দিয়েছে। আমরা তোকে ভাঙ্গিয়ে এনেছি জেনে কালেক্টর সায়েব শেষে চটে যাক আর কি!'

মনোহর ভাবিতেছিল, মিসেস লায়ইনের কাছে বিদায় না নিয়াও কাজ ছাড়িয়া দেওয়া চলিতে পারে, কাল সকাল হইতে এখানে কাজ আরম্ভ করিয়া

দিলেই হইবে। বিদায় নিয়া আসিলেও ক'দিনের মাহিনা পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। কিছু না বলিয়া হঠাৎ কাজে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলে মিসেস লায়ইনের মনে কত কষ্ট হইবে ভাবিয়া মনোহরের মনটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। রায়বাহাদুরের গিন্নীর মন্তব্য শুনিয়া সে যন্ত্রের মত বলিল, 'আজ্ঞে।'

রায়বাহাদুরের গিন্নী বলিল, 'তোকে যে ফুলগাছ আনতে বলেছিলাম, এনেছিস্?'

মনোহর এবারও শুধু বলিল, 'আজ্ঞে।'

আধুনিক সাহিত্য

কাব্যে নবযুগ

বাংলা সাহিত্য নিয়ে যাঁরা আজকাল কিছু কারবার করেন, তাঁরা প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন, বাংলা সাহিত্যে নাটক উপন্যাসের চেয়ে কবিতার রাজত্বে সোরগোল বর্তমানে অনেক বেশি। কিন্তু এ সোরগোলের কারণ বহু নয়, সম্ভবতঃ একটিই। কিছুদিন হতে বাংলা কবিতায় একটী বিশেষ কাব্যরীতিকে চালানোর চেষ্টা হতেই এই সোরগোলের উদ্ভব। একদল কাব্যামোদীর বিশ্বাস পূর্ব্বের কাব্যধারার প্রভাবমুক্ত হতে না পারলে বাংলা কাব্যের অগ্রগতি সম্ভব নয়; কিন্তু অপর দলের বিশ্বাস এই প্রভাব-মুক্তির নামে যে কাব্য সৃষ্ট হচ্ছে তা কাব্য নয়ই, কাব্যধারার অগ্রগতির পথে জঞ্জাল মাত্র; তাতে পাঠকের মন বিভ্রান্তই হচ্ছে, প্রকৃত কাব্যের দিকে তাদের চিত্ত উদ্বুদ্ধ হচ্ছে না।

সম্প্রতি এই বিতর্ক নতুন করে উঠবার একটী কারণ ঘটেছে। কবিতা-ভবন হতে প্রকাশিত "আধুনিক বাংলা কবিতা" নামে কাব্যসংগ্রহটী কেবল 'আধুনিক' রীতির কাব্যধারার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। "আধুনিক বাংলা কবিতা"র বিচার এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়, কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে যে আলোচনা সুরু হয়েছে, সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলবার জন্যই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। দুঃখের বিষয়, বহু বিদগ্ধ সমালোচকেরা স্বীকার করতে রাজি ন'ন যে এ কাব্যসংগ্রহ সার্থক হয়েছে; এবং শুধু যে এই বিশেষ কাব্যসংগ্রহটীই অসার্থক, তাই নয়। এ ধরণের যে কোনও কবিতাসংগ্রহই তাঁদের মতে অসার্থক হতে বাধ্য। কারণ বাংলা 'আধুনিক' কবিতা প্রকৃত কাব্যপদবী লাভ করিতে পারে না। এই বিদগ্ধ সমালোচকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তও অন্যতম। এবং শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে যে যে কথা বলেছেন, তাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করলে চলতে পারে। তার একটী বক্তব্য "বাংলা আধুনিক কবিদের মধ্যে ঐ সমরোত্তর যুগের মানসিক ও সামাজিক উপপ্লবের প্রভাবটী একেবারে নকল সুতরাং বাজে। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে ঐ কথাটা অক্ষমতার সাফাই। এই জরা-মরণগ্রস্ত মানুষের দুর্ভাগ্যে গত মহাযুদ্ধটা কি নূতন এনেছে যা কবির অন্তর্দৃষ্টিতে পূর্ব্বে ধরা পড়ার সম্ভব ছিল না? তবে ইউরোপীয় লেখকদের কথাটা কতক বোঝা যায়। Conscript army-তে ভর্ত্তি হয়ে তাঁদের অনেককেই সে যুদ্ধের হত্যাকাণ্ডে অংশ নিতে হয়েছে, তার দুঃখ ও ভয় ভোগ করতে হয়েছে। বাংলা আধুনিক কবি-সমাজে কোথায় সে অভিজ্ঞতা! এক বাঙালী হিন্দুর চাকরীর সংখ্যা ও বেতন কম ছাড়া কোন সামাজিক উপপ্লবের মধ্য দিয়ে তারা গিয়েছেন!"

শ্রীযুক্ত গুপ্তের আর একটী বক্তব্য মনে হয় কাব্যের প্রকাশভঙ্গী অকারণ সংক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে আধুনিক কবিতার রসোপলব্ধি ব্যাহত। সেই কারণে লেখক মন্তব্য করেছেন "শব্দের প্রয়োগ যেখানে চরম রকম থামখেয়ালি এবং ইচ্ছাকৃত বা অজ্ঞাত আভিধানিক অপপ্রয়োগ, কাব্যের উৎকর্ষের জন্য তার যে কতদূর প্রয়োজন ছিল তার ব্যাখ্যাও নিষ্প্রয়োজন নয়। এবং নিতান্ত অসম্ভব বোধ না করলে কবিতা যেখানে অতিরিক্ত রকম 'অর্থঘন' সেখানে একটু ব্যাখ্যার জল মিশিয়ে তরল করলে অনেক পাঠক গলাধঃকরণ করতে পারতেন এবং ক্রমে neat অভ্যাস হয়ে আসতো।" সেই সঙ্গে আরও বলেছেন—এই সংক্ষেপতত্ত্ব বোঝাবার জন্য এলিয়ট অবধি না এগোলেও চলত; 'আবোল-তাবোলের' ছড়ার মধ্যেই সে-তত্ত্ব বলা হয়েছে। তা হলে আধুনিক কবিতার প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে :—

আজকে দাদা যাবার আগে
বলব যা মোর চিত্তে লাগে
নাই বা তাহার অর্থ হোক
নাই বা বুঝুক বেবাক লোক।

এর সঙ্গে তিনি আরও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কোনও কোনও আধুনিক কবি সজ্ঞানে অসঙ্গতি আমদানীতে তৎপর এবং তার উদ্দেশ্য যাই হোক্ শোনায় যেন বিশুদ্ধ ইয়ার্কি।

শ্রীযুক্ত গুপ্ত আধুনিকতা সম্বন্ধে স্বকীয় মত কোথাও স্পষ্টভাবে বলেন নি। তবুও তাঁর ইঙ্গিত ও নানা পরোক্ষ প্রমাণ হতে মনে হয়, আধুনিকতার যে মূর্ত্তি পরিকল্পনা করে তিনি তাঁর বাগবিস্তার করেছেন, সে মূর্ত্তি নেহাৎই সংকীর্ণ, সে কেবল বিষ্ণু দে, সমুর সেনের একটী বিশেষ ভঙ্গীতেই সীমাবদ্ধ। কারণ তাঁর মতে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিতা বা মোহিতলাল মজুমদার বা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, হুমায়ুন কবির, অজিত দত্তের কবিতাকে "আধুনিকত্বের সরু দরজা দিয়ে টেনেহেঁচড়ে ভিতরে আনতে হয়।" আধুনিক কথাটী তাহা হলে সমালোচক অধুনাতন অর্থে নিশ্চয়ই গ্রহণ করেন নি এবং বাংলা আধুনিক কবিতা বলতে আজকাল যে কবিতা লেখা হচ্ছে এ অর্থের পরিবর্ত্তে, সম্ভবতঃ তিনি কল্পনা করেন, বাংলা আধুনিক কবিতা তাকেই বলা চলবে যার মধ্যে ছন্দ নেই, অর্থ সহজবোধ্য নয় এবং তার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ চিহ্ন সুপরিস্ফুট এবং তাই লক্ষণযুক্ত হলেই কাব্য আধুনিকতার পরীক্ষায় পাশনম্বর পেয়ে যাবে। আধুনিকতার এই সংজ্ঞা নির্দ্দেশের ফলে আমাদের মেনে নিতে হয় কাব্য শুধু আঙ্গিকেরই ব্যাপার, এবং সত্যিকারের কাব্যসৃষ্টির জন্য আঙ্গিক ছাড়া অন্য কিছুরই প্রয়োজন নেই। অন্ততঃ বাংলা আধুনিক কাব্য সম্বন্ধে এ-ধারণা পোষণ করলে এই সিদ্ধান্তের কবল হতে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন বলে মনে হয়।

শ্রীযুক্ত গুপ্ত সুপণ্ডিত এবং বিদগ্ধ সমালোচক বলে সুপরিচিত। তবু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়, বিদগ্ধ সমালোচকের এই মতের সঙ্গে অবিদগ্ধদের মত হয় তো সব সময় মিলবে না। এবং যেহেতু কাব্য শুধু কাব্যতত্ত্বজ্ঞদের জন্যই লেখা হয় না, সাধারণ পাঠক সমাজের জন্যই রচিত হয়, তখন সাধারণ পাঠক সমাজের কাব্য সম্বন্ধে কিছু বলার অধিকার নিশ্চয়ই আছে।

অবশ্য একথা প্রথমেই স্বীকার্য যে কোনও বিশেষ কাব্যসংগ্রহ কারুর ভাল না লাগলে সে সম্বন্ধে কোনও যুক্তি তর্ক বিস্তার করা সম্ভব নয় বা তার প্রয়োজনও নেই, কারণ ভালো লাগা ব্যাপারটা প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিগতই, তার সম্বন্ধে আইনের জোর খাটবে না। সে-হিসেবে প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে উল্লিখিত কাব্যসংগ্রহটি যে লোকান্তর হয়েছে এমন কথা প্রমাণ করতেই হবে বলে আমার কোনও চেষ্টা নেই। সেই সঙ্গে একথাও স্পষ্টভাবে স্বীকার করা ভালো যে আধুনিক বাংলা কাব্যের মধ্যে কৃত্রিমতা আছে এবং হয় তো যথেষ্টই আছে—যার ফলে ভালো কাব্য সৃষ্টির পক্ষে বাধা জন্মাচ্ছে। কিন্তু এ-কথাও স্বীকার করা চলে না বর্তমানে বাংলা কাব্যে যে নতুন প্রচেষ্টা চলছে তার সবটুকুই কৃত্রিম এবং সবটুকুই মেকি, এবং আমাদের সমাজে এমন কিছুই হয়নি যার ফলে এরকম কাব্যচেষ্টার কোনও সঙ্গতি ও সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে জগৎময় যে তুমুল আলোড়ন চলেছে, তার ছায়া যদি আমাদের দেশে প্রতিফলিত হয়, তা হলে তার সবটুকুই নকল সুতরাং বাজে এ-কথা যাঁরা আজও পঞ্চাশোর্দ্ধ পার হন নি তাঁদের পক্ষে বলা দুঃসাহস বৈ কি। আমাদের সমালোচকের প্রধান যে তিনটি বক্তব্যের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি, একে একে তার আলোচনা করা যাক্। তার প্রথম বক্তব্য, সমরোত্তর যুগের ধুয়া ইউরোপেও অক্ষমতার সাফাই মাত্র। এবং এদেশে ও-কথার দোহাই দেওয়া চলতেই পারে না, কারণ ও-দেশে যদি বা বাধ্যতামূলক সৈনিকবৃত্তির ফলে অকারণ নরহত্যা কবি-মনে গভীর রেখাপাত করে যায়, এ-দেশে কবিদের সে রকম অভিজ্ঞতা একেবারেই নেই, কারণ বাঙালী হিন্দুর চাকরীর সংখ্যা ও বেতন কম ছাড়া অন্য কোনও সামাজিক উপদ্রবই এদেশে হয় নি।

এ-কথা সহজে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে ওঠে। তাহলে কি মনে করতে হবে মহাযুদ্ধের পরে যত কবি আধুনিক ফ্যাশানে কবিতা লিখেছেন তাঁদের সে কবিতার মূলে কেবলমাত্র অক্ষমতা ছাড়া অন্য কোনও কারণই ছিল না? তাদের মনে এমন একটী প্রেরণা কি কখনও আসে নি, যা কেবল 'আধুনিক' ভঙ্গীতেই প্রকাশিত হতে পারে, অন্য কোনও ভঙ্গীতে নয়? এ-কথাও কি স্বীকার করতে হবে, যে সব কবি অন্যথায় কলাবৈকল্যে রসোত্তীর্ণ বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন, তাঁরা শুধু অক্ষমতার আবরণ হিসেবেই আধুনিকতার ব্যবহার করেছিলেন,—এ অসাধুতায় তাঁদের একটুও বিবেক দংশন হয় নি? কি এমন কারণ থাকতে পারে যে ইয়েট্‌সের মত কবি—যিনি যৌবনে রাশি রাশি 'অনাধুনিক' কাব্য লিখে পাঠকসমাজের মনোহরণ করেছিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় কঠোরতর কাব্যকলায় তৃপ্তি লাভ করলেন। কেউ কি এ-প্রশ্নও মনে করবেন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্বশক্তি ক্ষীণভূয়িষ্ঠ হওয়ার ফলেই এ-পরিবর্তন অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল? কেই বা মনে করবেন, ডি এচ্ লরেন্স যাঁর কাব্যসংগ্রহের একটী বৃহৎ অংশ সমিল 'আধুনিক' কবিতায় ভর্তি, তিনিও স্বেচ্ছায় 'আধুনিক' কাব্যসৃষ্টি করবেন? এমনকি রবীন্দ্রনাথও যখন বলেছিলেন "যাকে সচরাচর আমরা গদ্য বলে থাকি সেটা আর আমার আধুনিক কাব্যের ভাষা এক নয়, তার একটা বিশেষত্ব আছে তাতে এটা কাব্যের বাহন হতে পারে····· এই ভঙ্গীতে আমি যা লিখেছি ·····তা অন্য কোন ছন্দে বলতে পারতুম না" (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৩)। তখন ভাবতে হবে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই কোন সাধু মুহূর্তে অতি সত্যভাষণের আকাঙ্ক্ষায়

তাঁর অক্ষমতার স্বীকারোক্তি করে ফেলেছেন। আর সেই সঙ্গে সমরোত্তর যুগে ইংরেজ, ফরাসী বা মার্কিন জাতের মধ্যে আধুনিক কবিকুলের যে অসাধারণ বৃদ্ধি, একি কেবলই অক্ষমতার জন্য? এমন সন্দেহ কি মনে জাগা অসম্ভব নয় যে যখন কবিকুল সমষ্টিগত ভাবেই সমালোচকের মাপকাঠিতে, অক্ষমের পর্য্যায়ে নেমে যান তখন হয়তো সমালোচক ও কবির মধ্যে কোথায়ও মূলগত বিরোধ বেধেছে এবং কবি সম্প্রদায় যেটীকে কাব্য বলে গ্রহণ করেছেন, সমালোচক সেটীর কাব্যত্ব অস্বীকার করার ফলেই কবিরা স্বকীয় আদর্শে রসসৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও সে সমালোচকের দৃষ্টিতে তাঁরা চিরকালই অক্ষম রয়ে যাবেন। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রকৃত রসসৃষ্টি হলে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সেটী রস বলে গ্রাহ্য হবে অপরের পক্ষে হবে না এরকম দ্বৈতরূপ রসের পক্ষে সম্ভব কিনা। যদিচ এর উত্তর সংক্ষেপে সম্ভব নয়, তবুও একরকায় বলতে হলে বলতে হবে রসোপলব্ধিও সংস্কারের উপর নির্ভরশীল আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকদের ভাষায় সহৃদয় ছাড়া অন্য কারুর কাছে রস প্রতীত হয় না।

সেই সঙ্গে বাংলার সমাজবিবর্তনের কথাও অস্বীকার করা চলে কি? একটা কথা মনে রাখা ভালো সমাজবিবর্তন ব্যাপারটী এতই নিগূঢ়, এতই নিঃশব্দসঞ্চরণশীল, যে তার গতি সহজে ধরা সম্ভব নয়। এমন কি যখন সংখ্যাতত্ত্বের মাপকাটীতে কোনও সমাজবিবর্তন ধরা পড়ে না, তখনও যে সমাজের গতি স্তব্ধ এ-কথা বলা চলবে না। কারণ সমাজ ব্যষ্টি ও সমষ্টির বস্তুজগতের ও মনোজগতের মধ্যে পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতের লীলা ছাড়া আর কিছু নয়। সে কারণে সমাজের বহিরাবরণ অটুট থাকলে তার পরিবর্তন হতে পারবেই না এমন কোনও কথা নেই, কারণ পরিবর্তন ব্যাপারটী শুধু বাস্তব নয়, মানসও বটে। তাই যতদিন দরিদ্র কৃষকেরা তাদের ভাগ্যে সন্তুষ্ট হয়ে থাকবে তাদের অভাব থাকবে না। কিন্তু যখন তাদের দরজায় ভবিষ্যত উন্নতির বাণী এসে আঘাত করবে তখন তাদের বাস্তব জগতে কোনও পরিবর্তন না হলেও তারা পূর্বের সঙ্গে অভিন্ন থাকবে না। ফরাসী বিপ্লবের বাণী শুনবার আগে ও পরে ইংলণ্ডের কৃষকসম্প্রদায় বোধ হয় ঠিক এক ছিল না যদিও তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তবিক পরিবর্তন হয়েছিল বহু বৎসর পরে। তেমনি যখন এদেশের হাওয়াতেও নানা রকম বুলি চলতে সুরু হয়েছে তখন সে বুলি ধার করা হলেও তার ফলে আমাদের সমাজের বিভিন্ন স্তরে মানসিক হাওয়া বদল হয় নি একথা কি জোর করে বলা চলতে পারে? আর এ-কথাও নিশ্চয়ই সকলে স্বীকার করবেন যে মানসিক হাওয়া বদলই কাজের পূর্বদূত এবং যদি কবিরা বাহ্য ও বাস্তব পরিবর্তন আসার আগেই নবযুগের গান গাইতে সুরু করেন তাহলে কি তাঁদের ক্রান্তদর্শী বলে অভিনন্দিত করার পরিবর্তে তাঁদের চিন্তাধারা অসামাজিক ও অলীক বলে আমরা কি ব্যঙ্গ হাসি হাসব?

কিন্তু মানসিক হাওয়া বদলের কথা ছেড়েই দিলাম। বাস্তব জগতেও আমাদের দেশে কি সামাজিক পরিবর্তন, যা পূর্বের সঙ্গে তুলনায় উপদ্রবী বলতে হবে, দেখা যায় নি? যে দেশে আইন ও দণ্ডের সংজ্ঞা অভিন্ন ছিল সে দেশে আইন সভার অধিকাংশ সময় সামাজিক (social) আইন প্রনয়ণে ব্যয়িত হবে একথা আগে কল্পনা করা চলতো না। প্রবন্ধটী সমাজবিবর্তন সম্বন্ধে নয়, তা না হলে আরও উদাহরণ দেওয়া চলতে পারতো।

(৩)

এই সব কারণে আধুনিকতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গুপ্ত যে ধারণা পোষণ করেন, অনেকের মতেই সেটাও যুক্তিগ্রহ হবে না। আধুনিকতা সম্বন্ধে তিনি যে-কিছু মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তাতে মনে হয় অমিল কবিতা, গদ্য-কবিতা, অ-রোমান্টিক কবিতা, নতুন ধরণের উপমা প্রভৃতি জড়িয়েই আধুনিকতা—আধুনিক কালের লেখা কবিতা আধুনিক নয়। সেই কারণে সমালোচকের মনে হয় মোহিতলালকে আধুনিকতার সরু দরজা দিয়ে টেনেহিঁচড়ে আনতে হয়, হয়তো সমিল ও অ-দুরূহ কবিতা লেখেন বলেই অজিত দত্ত 'আধুনিক'দের পংক্তিচ্যুত। কিন্তু বলাই বাহুল্য আধুনিকতার এ সংজ্ঞা শুধু সঙ্কীর্ণই নয়, বিকৃতও। নানান যুগের মানুষ নানা ভাবে নানা চিন্তা করে এসেছে, তাদের রসোপলব্ধির পন্থা যুগে যুগে বদলে যায়। কিন্তু নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়েও কাব্যের দায়িত্ব অবিচল থাকে। মানুষের মনে যে নানা বিচিত্র ভাবের উদয় হয়েছে সেই ভাবকে শুধু প্রকাশ দেওয়া এবং ফলে পাঠকচিত্তে রসসৃষ্টি করার কালেই কাব্য নিযুক্ত হয়ে এসেছে। মনে রাখতে হবে এই রসসৃষ্টি সময় বিশেষে নির্ভর করে সাময়িক নানা ঘটনার উপর। তাই যদি নতুন যুগের মানুষ নতুন ভাবে ভাবতে শেখে তাহলে প্রকৃত কাব্যের কাজ হবে সেই নতুন যুগের চিন্তাধারাকে নতুনতর ভাবে প্রকাশ করা, যাতে প্রকৃত রসসৃষ্টি সম্ভব হতে পারে। যদি এমন একটা দেশ কল্পনা করা চলে যেখানকার পাঠক সমাজের প্রত্যেক সত্যই ঋষ্যশৃঙ্গের অনুকারী, সেখানে ডন্‌জুয়ানী কবিতা ভালো লাগবেই না, একথা জোর করে বলা চলতে পারে। কিন্তু কোনও ডন্‌জুয়ানী সমাজে সে-কাব্য অন্য প্রভাব বিস্তার করবে এ-কথাও নিঃসঙ্কোচে বলতে পারা যায়। তাই আধুনিক বাংলা কবিতার আধুনিকতা বিচারের মাপকাঠি ছন্দের মিলহীনতা বা শব্দের দুরূহতা নয়, তার আসল মাপকাঠি সে-কাব্য আধুনিক পাঠক-সমাজের যে রসানুভূতি তাতে কোনও তরঙ্গ তুলতে পেরেছে কিনা, সে-কাব্য আধুনিক কালের আশা আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ দিতে পেরেছে কিনা, তাই আধুনিক কবিতা বলি তাকে যাতে আমাদের কালের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে, যাঁতে আধুনিক নানা সমস্যার স্পন্দন আছে, আধুনিক সমাজের ছায়া আছে এবং আধুনিক রসবোধের পরিতৃপ্তির উপাদান আছে। তাই যদি প্রমাণিত হয়, বাংলার তথাকথিত 'আধুনিক' কবিতায় কাব্যের এই লক্ষণগুলি আছে তাহলে স্বীকার করতেই হবে সে-কাব্য আধুনিক এবং সে-কাব্য সার্থক—এবং যে সমালোচক সেই কাব্যে আনন্দবোধ করবেন না, মনে করতে হবে সে সমালোচকের রসবোধ পাঠক সাধারণের রসবোধ হতে বিভিন্ন এবং সেজন্য তাঁর পরিতৃপ্তিকর কাব্যও বিভিন্ন। কিন্তু সেজন্য নতুন কাব্য অসার্থক এ-কথা একবারের জন্যও স্বীকার করা চলবে না।

দুঃখের বিষয় সমালোচক আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে আলোচনায় এ-পন্থায় অগ্রসর হন নি। তাঁর মতে আধুনিকতার কয়েকটি লেবেল আছে এবং কবিতা রসোত্তীর্ণ হোক্ বা না হোক্ সেই লেবেলের জোরেই কাব্য পদবীতে স্থান লাভ করবে। এ-কথা বলা শুধু যে দুঃসাহস তাই নয়, এতে কাব্যের মূল প্রকৃতিকে অবিচার করা হয়।

বাংলা আধুনিক কবিতার কোনও সার্থকতাই নেই যদি তারা একালের পাঠক-সমাজের চিত্তে রসসঞ্চার না করতে পারে, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, তাদের সমস্যাকে রূপ না দিতে পেরে থাকে। বাংলা আধুনিক কবিতা যদি এ বিষয়ে অক্ষম হয়ে থাকে, তবে তাকে সরাসরি বাদ দিলে একটা পাঠকেরও আপত্তি হবে না। কিন্তু এ বিচারের পরিবর্ত্তে যদি আমরা শুধু শব্দের দুরূহতা, প্রকাশভঙ্গীর ঘনত্ব বা অনুরূপ দুই একটা চিহ্নের জোরেই কবিতাকে আধুনিক ঘোষণা করে তাকে ফাঁসি দিই তাহলে এ বিষয়ে পদ্ধতি শুধু যে সেই প্রবাদ প্রসিদ্ধ কুকুরকে অযথা বদনামের পর ফাঁসি দেওয়ারই সামিল তাই নয়, এ বিচার পদ্ধতিতে যদি কোনও কবিতা সত্যই আধুনিক হয়ে থাকে, তার শিরশ্ছেদ হওয়ারও সম্ভাবনা যথেষ্ট।

লেখক অবশ্য এখানে প্রশ্ন তুলতে পারেন বাঙালীর জীবনে নতুন এমন কি এসেছে যার ফলে কাব্যে নতুন ভঙ্গী ও ভাবের প্রয়োজন হল? বাস্তবিকপক্ষে এইটাই আসল প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নটার প্রকৃত বিচার হয় নি বলেই সমালোচনাটা দুষ্ট বলে আমার ধারণা। লেখক অবশ্য পরিশিষ্টে এ প্রশ্ন তুলেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে কবিতায় হাওয়া বদল সম্বন্ধে এমন একটা সন্দেহ তুলেছেন যা পড়লে স্তম্ভিত হতে হয়। তিনি বলেছেন :—"এই জরা-মরণ-গ্রস্ত মানুষের দুর্ভাগ্যে গত মহাযুদ্ধটা কি নূতন এনেছে যা কবির অন্তর্দৃষ্টিতেও পূর্ব্বে ধরা পড়ার সম্ভব ছিল না?······আর আজকের বণিক্-সভ্যতার যে অত্যাচার, বদল চেহারায় তা সকল যুগেই ছিল।" তাঁর এই মন্তব্য হতে মনে হয় শুধু যে আধুনিক যুগে কোনও নতুন জিনিষ আসেনি তাই নয়, কাব্যে কোনও সময়েই নতুন বলে কিছু হতে পারে না। মানুষ পূর্ব্বেও মরেছে, তফাৎটা আর কোথায়? আর বণিক্-সভ্যতা ত চিরকালই ছিল!

এ-কথা যদি সত্য হয়, তাহলে মনে হবে প্রেম সম্বন্ধে আদি কবি হতে আরম্ভ করে আধুনিকতম কবি পর্য্যন্ত হাজারে হাজারে কবির কাব্য লেখার কোনই সার্থকতা নেই। রামায়ণ একটা প্রেমের কাহিনী বলে আর ভবভূতির কাব্য লিখিবার দরকার ছিল না; শকুন্তলার গল্প মহাভারতে বলা ছিল বলে তাকে নতুন করে লেখবার দরকার ছিল না। ট্রয়লাস ক্রেসিডার গল্প তো চসারই বলে গিয়েছিলেন, তার উপরে সেক্‌স্‌পীয়র আর পণ্ডশ্রম করলেন কেন? মানুষ চিরকালই মরে এসেছে বলে হ্যামলেট ম্যাক্‌বেথ লিখ্‌বার দরকার বোধ হয় ছিল না। পুরান, উপনিষদের কাহিনীকে কবিতাবদ্ধ করার কোনও দরকারই রবীন্দ্রনাথের ছিল না। বিবাহিত জীবনের প্রত্যেক সমস্যাটাই তো পূর্ব্বতন কবিরা তাঁদের অন্তর্দৃষ্টিতে ধরে ফেলেছিলেন, তবে আর সে বিষয়ে নতুন করে কোনও বই লেখা চল্‌তে পারে না বা সে বিষয়ে বই লিখলেও তার কোন নূতনত্ব, কোনও সার্থকতাই থাকতে পারে না। আমাদের যুগে দুটা মানুষের প্রেম-কাহিনী বলার কোনও অধিকারই আমাদের নেই, কারণ দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এত পিছনে জন্মেছি। বর্ত্তমানের বণিক্-সভ্যতা যদি পূর্ব্বে থেকেও থাকে, তাহলেও তার ঘাত-প্রতিঘাত আমাদের যুগে আমাদের নতুন করে অনুভব করার এবং কবিতায় প্রকাশ করার কোনও অধিকার নেই।

বাস্তবিকপক্ষে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তের মতো সমালোচকের কাছ হতে এই অদ্ভুত কথা সহজে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না, মনে হয় না তাঁর মত কাব্যামোদীর এরকম উন্নাসিক

মনোবৃত্তি ও অসহৃদয় ভাব কাব্যকলার মূলে কুঠারাঘাত করতে প্রবৃত্ত হবে। আর বাস্তবিকপক্ষে এটা যে তাঁর স্বাধর্ম্ম্য নয়, কেবলমাত্র আক্রমণের অস্ত্র, সে প্রমাণ তিনি অনবধানতাবশতঃ এই প্রবন্ধের মধ্যেই রেখে গেছেন। তা না হলে তাঁর পক্ষে কি করে বলা সম্ভব হতে পারে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের একটা সার্থক কবিতা যে "মুড়ের" কাব্যরূপ, ভগবান বুদ্ধের জীবনও সেই "মুড়েরই" কর্ম্মরূপ—যতীন্দ্রমোহন বাগচীর একটা কবিতা সার্থক হয়েছে ভাব ও ভঙ্গীর কোনও আধুনিকত্বে নয় কাব্যরসের সার্ব্বকালিকত্বে ; সেই জন্য মনে হয়, তার প্রকাশ্য ওকালতি ও তার স্বগতোক্তি এক্ষেত্রে এক নয় এবং এক না হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই কারণে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধ পড়তে পড়তে মনে প্রশ্ন জাগে কাব্যের সার্থকতার লক্ষণ কি? শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিতাটাকে তিনি সার্থক বলেছেন—ভাব ভঙ্গীর কোনও 'আধুনিকত্বে' নয়, কাব্য-রসের সার্ব্বকালিকত্বে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতাও সেই কারণে সার্থক পদবী লাভ করেছে। তাহলে শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয়ের মতে সার্থকতার পাশ নম্বর পেতে হলে কাব্য-রস সার্ব্বকালিক হতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয় আরও দুটী কবিতাকে সার্থক বলেছেন—সে কবিতার রস আগের কবিতার রস হতে পৃথক্। কিন্তু তার মধ্যে সরলতা আছে, ছন্দ ও অলংকার পুরাতন, শব্দ প্রয়োগ অনাধুনিক—শব্দার্থের জন্য গলদঘর্ম্ম হতে হয় না। তাহলে তাঁর মতে সার্থকতার দ্বিতীয় পাশমার্কা পুরাতন ছন্দ এবং অলংকার, "আধুনিক" শব্দপ্রয়োগ সহজবোধ্য শব্দার্থ।

বলাই বাহুল্য সার্থকতার এ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ যদি বা ভুল না হয়, অসম্পূর্ণ নিশ্চয়ই। তাঁর প্রথম কথাটা ধরা যাক্। কাব্যরস সার্ব্বকালিক না হলে কাব্য সার্থক হতে পারে না। তাহলে তিনি কি করে লিখলেন :—"চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজ কুমার' কবিতায় এ সরল সত্যটা বণিক-সভ্যতার চেহারা বদলের কথা কাব্যের রূপ পেয়েছে।" তাঁর কবিতাটা যদি কাব্যপদবী লাভ করে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই কাব্যরসের সার্ব্বকালিকতায় তা সম্ভব হয় নি।

সামন্ততন্ত্র হতে সুরু করে আধুনিককাল পর্য্যন্ত সমাজের ক্ষমতাপন্ন শ্রেণীদের যে চেহারা বদল হয়েছে কবিতাটাতে তার সুন্দর বর্ণনা আছে—এতই সুন্দর বর্ণনা যে শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয়ের মতেও সে কাব্যপদবীতে স্থান লাভ করেছে। কিন্তু অন্য কোনো কালে শেয়ার বাজার, তেজি-মন্দির কথা কবিতায় লেখা হয়েছে বলে আমার—এবং সম্ভবতঃ লেখকেরও—জানা নেই। আর অ্যাসেম্ব্লি হল্ তো প্রায় দু' বৎসরের ব্যাপার বললেও চলে। উইটান-আ-গেমট বা নেহাৎপক্ষে পার্লামেন্ট থাকলেও সার্ব্বকালিকত্বের ধারে কাছে পৌছতে পারতো—তার সর্ব্বকালের না হোক্ দীর্ঘকালের প্রসিদ্ধি আছে। সেই সঙ্গে যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর যে কবিতাটাকে তিনি সার্থক কবিতা বলেছেন সার্ব্বকালিক রসের জন্য, সেই কবিতাটাতে যখন পড়ি যে ভুটিয়া যুবতী—

উথারি' বুকের বাস পূরায় বিচিত্র আশ
উরস পরশি' নিজ হাতে!

তখন প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে এখানে আত্মরতির রসই কি সার্থক রস, এবং যদি তাই হয় তবে সে রস কবিতায় সার্ব্বকালিক কিনা? সেই সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর 'ম্যাল্-এ' শীর্ষক যে

কবিতাটা পড়ে তিনি হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন তীক্ষ্ণ দাঁত দেখানো নেই বলে—তাতে যখন পড়ি যে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে—

নিখুঁত বাংলা ফোটে ফিরঙ্গ রঙ্গে
ইংরিজি সুরে তির্য্যক গতিভঙ্গে।
আমরা চম্‌কে থমকে দাঁড়াই, হয়তো বা কারো জুতোই মাড়াই,
বাংলা শুনেই সার্থক শ্রম চৌরাস্তায় সন্ধ্যেবেলায় হাঁটলে,
ভাবি শুধু এই অমনি সুরেই বেরোবে কি বুলি হঠাৎ চিম্‌টি কাটলে?

তখনও জিজ্ঞাসার ইচ্ছা হয় এই চিম্‌টিকাটা কাব্যের রস সার্থক ও সার্ব্বকালিক বলে শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয় বিশ্বাস করেন কিনা এবং চিমটি ও দাঁত দেখানো ঠিক এক পর্য্যায়ের নয় বলেই কি কবিতাটা শ্রীযুক্ত গুপ্তের মাপকাঠিতে রসোত্তীর্ণ? ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে "কাব্যবোধের রেটিনায় এরকম ব্লাইণ্ড-স্পট" (শ্রীযুক্ত গুপ্তের ভাষাই উদ্ধৃত করলাম) জন্মায় কি করে? আর সেই সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের

আমি কবি ভাই কামারের আর কাঁসারির
আর ছুতোরের, মুটে মজুরের
—আমি কবি যত ইতরের

এ কবিতাটাই বা কি করে তাঁর হিসেবে সার্থক কবিতার পর্য্যায়ে স্থান পেতে পারে? কাব্যে এই হরিজনী প্রভাব সার্ব্বকালিক নয়ই, এমন কি বেশি দিনের ত নয়। আর কাব্যরস সার্ব্বকালিক হতেই হবে এরকম ধারণা থাকলে কি করে লেখা চলতে পারে "কবি তাঁর কাব্যের যাদুতে যে outlook পাঠকের মনে ঘনিয়ে তুলতে পারেন তখন তাই সত্য"?

আসলে এই সার্ব্বকালিক কাব্য-রসের কল্পনাটা এক্ষেত্রে লেখকের আত্ম-বিস্মৃতি ও চিত্তবিভ্রমের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সার্ব্বকালিক বলতে শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয় নিশ্চয়ই পাঁচ হাজার বৎরের অসংলগ্ন কবিতার মূলধারাকে বোঝেন না এমন কি এন্থে অন্ ম্যানের কাব্য-রসকেও নিশ্চয়ই ইঙ্গিত করেন না। তাঁর সার্ব্বকালিক বাস্তবিকপক্ষে আমরা গত দেড়শ বছরে যে কাব্যরসে অভ্যস্ত হয়েছি, সেই কাব্যরসই তাঁর 'সর্ব্ব'কালের বিস্তৃতি, বড় জোর দুই শতাব্দীর। তাঁর যে যে কবিতা ভাল লাগে বলে তিনি স্বীকার করেছেন সেই কবিতাগুলির আলোচনা হতেই একথা প্রমাণিত হয়। কিন্তু গত শতকের প্রথম ভাগে নবজাত উৎসাহের ফলে কবিরা যেমন নতুন জগত গড়বার স্বপ্ন দেখেছিলেন, কল্পনা করেছিলেন তাঁরাই জগতের অদৃশ্য ভাগ্য-বিধাতা, মনে করেছিলেন যেটা তাঁদের পক্ষে ভালো সেইটাই জগতের পক্ষে ভালো—আধুনিক সমালোচকেরও যে সেই আত্ম-বিস্মৃতি হবে একথা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু তা না হলে সময়বিশেষের কাব্যভঙ্গীকেই সার্ব্বকালিক আখ্যা দেওয়ার অন্য কি ব্যাখ্যা হতে পারে?

বাস্তবিকপক্ষে শ্রীযুত গুপ্ত মহাশয় নিজেই সার্থক কবিতার একটা ভালো সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেছেন, যদিও তিনি সেটাকে কাব্যবিচারের মাপকাঠি করেন নি। তিনি বলেছেন কবি

তাঁর কাব্যের মাধ্যমে যে outlook পাঠকের মনে ঘনিয়ে তুলতে পারেন, তখন তাই সত্য, এবং এ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করলে আধুনিক কবিতার মধ্যে ভালো কবিতা পাওয়া যাবে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘অগ্নি-আখরে’, ‘নীলকণ্ঠ’, বিষ্ণু দের ‘গার্হস্থ্যাশ্রম’, ‘বেকার বিহঙ্গ’, ‘টপ্পা-ঠুংরি’, ‘চোরাবালি’ প্রভৃতি আমার ভালো লাগে—পাঠকেরা বিচার করে দেখতে পারেন সেগুলি রসোত্তীর্ণ কিনা।

ঠিক এই কারণেই শ্রীযুক্ত গুপ্তের দ্বিতীয় যুক্তিও বিচার-সহ নয়। তাঁর পুরাতন ছন্দ ও অলংকার মানে কিছুদিন পূর্ব্বেকার ছন্দ ও অলংকারই—কারণ এক্ষেত্রে সার্ব্বকালিক বলে কিছু সম্ভব নয়। এমন কি মাইকেলকে যদিও আমরা বড় কবি বলে স্বীকার করব তবুও তাঁর কাব্যরীতিকে সজ্ঞানে চালাতে আমাদের বর্ত্তমানে বাধবে। শ্রীযুক্ত গুপ্তও নিশ্চয়ই চাইবেন না এখন ভোলা ময়রার ছন্দ অলংকার বাংলা কবিতায় চালাতে হবে। তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন না যে

ব্যারিষ্টার উকীলাদি মহাযজ্ঞ সমাধিলা।
ভারতে ভারি অদ্ভুত আশ্চর্য্য মহতী সভা॥
আসিলা সে মহাযজ্ঞে মহারাষ্ট্রীয় পশ্চিমে।
মন্দ্রাজি উড়িয়া শীখ বঙালি চ দলে দলে॥
এরূপ কত যে মূর্ত্তি সমাগত সভাস্থলে।
বক্তৃতা করিয়া বাবা লড়াই করিতে ফতে॥

এই তিনটী অনুষ্টুপ ছন্দে লেখা শ্লোক নিম্নোদ্ধৃত কাব্যাংশের চেয়ে ভাল :—

রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী করে,
যতক্ষণ চিনি নাই তোরে? ইত্যাদি—

কারণ প্রথমটীর ছন্দেই আদিকবির শোক শ্লোকত্ব পেয়েছিল এবং দ্বিতীয়টীর ভাঙ্গাচোরা ছন্দের হয়তো এখনও সাবালক হবার বয়স হয় নি। আর শব্দার্থের সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযোজ্য—কারণ সহজ শব্দার্থই যদি কাব্যরাজ্যের ছাড়পত্র হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতিতে উদ্ধৃত “মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে।” কবিতাটী নিশ্চয়ই তাঁর ‘উর্ব্বশী’ বা ‘তপোভঙ্গের’ চেয়ে ভাল কারণ প্রথমটীর শব্দার্থ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সরোবরের চেয়েও স্বচ্ছ।

আসলে সার্ব্বকালিক রসের যে পরিকল্পনা শ্রীযুক্ত গুপ্ত করেছেন, সেরকম সার্ব্বকালিক রস বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। যুগে যুগে মানুষ নানাভাবে রস উপভোগ করতে শিখেছে, তার রসের উপকরণ বিচিত্র হতে বিচিত্রতর হয়ে এসেছে। প্রতি যুগের রুচি, প্রতি যুগের সমস্যা, প্রতি যুগের রস-সৃষ্টির পদ্ধতি সেইজন্য বিভিন্ন। কাব্যের সার্থকতা সেইখানেই যেখানে রস-সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু কোনও আইন করা চলতে পারে না এই বিষয়ে। কবিতা লিখতে হলেই তা সার্ব্বকালিক কাব্যরসের পর্য্যায়ে পড়বে, আর তা না হলে তা কাব্যপদবী লাভ করতে পারে না, কারণ কবিতার বিষয় বলে চির নির্দ্দিষ্ট কোনও জিনিষ থাকা সম্ভব নয়।

এই কথাটার সুষ্ঠু উপলব্ধি হলে শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয়ের দ্বিতীয় কথাটাও স্বতঃই খণ্ডিত হয়। শব্দার্থ সহজ এবং ছন্দ ও অলংকার প্রচলিত রীতির হলেই কবিতা ভালো হবে, এমন কোন কথা নেই। দেখবার বিষয়, শব্দ ও অর্থে ঠোকাঠুকিতে কাব্যদীপ্তি চমক দিয়ে উঠল কিনা। যদি সে দীপ্তি প্রকাশ পেয়ে থাকে তবে সহজতার জন্য ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। একথা অস্বীকার করা চলে না বহুসময়ে—এমন কি প্রায় সব সময়েই মুখ্যার্থবোধেই শ্রেষ্ঠ কাব্যের উৎপত্তি। আমি বলছি না যে দুরূহতাই কাব্যের গুণ, কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থের ব্যবহার অস্বীকার করলে শ্রেষ্ঠ কাব্যকেই অস্বীকার করা হবে। অবশ্য প্রশ্ন করা চলতে পারে আধুনিক বাংলা কাব্যে যে দুরূহতা এসেছে সেটী রস-সৃষ্টির সহায়ক কিম্বা নিছক দুরূহতাই। কারণ যদি সেগুলি শুধু দুরূহতা হয় তাহলে কাব্যের দিক দিয়ে তার কোন সার্থকতাই নেই। এর উত্তর অবশ্য ব্যক্তিবিশেষে বিভিন্ন হতে বাধ্য। কিন্তু হয়তো বলা চলতে পারে আধুনিক বাংলা কাব্যে সাধারণতঃ আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠকের যে জ্ঞানভাণ্ডার আছে, তার কচিৎ-ব্যবহৃত কোনগুলির ব্যবহার হয়েছে মাত্র, কিন্তু তার খুব বেশী বাইরে যায় নি। ‘সাধারণতঃ’ বলেছি এই কারণে যে এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম থাকা আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু প্রথম প্রচেষ্টার আতিশয্য হিসেবে সেগুলি অনুকম্পার পাত্র হলেও বাংলা আধুনিক কাব্যের দুরূহতা যে কাব্যরসের সহায়ক কোনখানেই হয় নি এমন কথা বলা চলবে কি করে? বরং অতুলচন্দ্র গুপ্তের ভাষায় বলা চলতে পারে, কাব্যবীণা একতারা নয়, অর্কেষ্ট্রাই। কবি ও পাঠকের মনে নানা বিচিত্র সুরের নানা টুকরো উড়ে বেড়ায়, সেগুলিকে যদি একটী সার্ব্বকালিক কাব্যরসে ফেলবার প্রয়োজন হয় তাহলে সে “অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গীর” দায়ে কাব্যলক্ষ্মীর অকালমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

বাংলা আধুনিক কবিতা যাঁরা আলোচনা করবেন তাঁদের মনে রাখতে হবে একালে যে কাব্য লেখা হয়েছে তার মধ্যে বহুস্থানেই কবি আশা করেন, পাঠকের মনে কিছু পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞান সঞ্চিত আছে। ফলে কবির কাব্যে আমরা একেবারে প্রথম হতে সুরু পাই না, প্রথম ধাপটী পূর্ব্বেই গড়া হয়ে আছে। এই সংক্ষিপ্ত-করণের ফলে বাংলা কবিতা সর্ব্বসাধারণের হয়ে ওঠে নি, কতকগুলি চলতি খবর না জানা থাকলে এ কাব্য উপভোগ সম্ভব নয়। কিন্তু সেজন্য যাঁরা উপভোগক্ষম তাঁদের পক্ষে রস সৃষ্টি হয় নি একথা একেবারেই বলা চলে না। যদি কেউ আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে এর পাঠক গোষ্ঠী সংকীর্ণতর হবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে এবং সে কারণে সামাজিকভাবে কাব্যলক্ষ্মীর মর্য্যাদাহানি অসম্ভব নয়, তাহলে আপত্তি করবো না। কিন্তু যদি কেউ বলেন এ রসসৃষ্টির পথে শুধু বাধাই, এবং কোনও রসই সৃষ্ট হয় নি, তাহলে সে কথা স্বীকার করা কঠিন হয়ে পড়ে। :এ কারণে তাঁর তৃতীয় বক্তব্যের আলোচনা প্রয়োজন।

(৫)

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত আধুনিক বাংলা কবিতা সম্বন্ধে অভিযোগ করেছেন যে আধুনিক বাংলা কবিতায় ক্ষিপ্রগতির জন্য, কবিতাকে সংক্ষিপ্ত ও ঠাসা করবার জন্য, কাব্যের প্রকাশ ক্ষমতা বাড়াবার জন্য আধুনিক কবিরা সকলরকম ঢিলেমি ত্যাগ করেছেন। ফলে কাব্যের

অপকর্ষই হয়েছে, উৎকর্ষ হয় নি। এমনকি এমন কবিতাও সৃষ্ট হয়েছে যার তত্ত্ব কেবল আবোল-তাবোলের ছড়ার সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা চলে—যেটা Waste Land এর কাব্য না হয়ে, হয়ে দাঁড়ালো কাব্যের Waste Land.

এখানে অবশ্য অনেক পাঠকই শ্রদ্ধেয় লেখকের সঙ্গে একমত হবেন। বাংলা আধুনিক কবিতায় বহুস্থানে এই ঘনত্বের খেয়াল এতদূর গিয়েছে যার ফলে প্রকৃত কাব্যের হানি হয়েছে। একথাও সেই সঙ্গে স্বীকার করতে হবে "অনেক সময় এঁদের লেখা এমন একান্ত ব্যক্তিগত উপকরণের দ্বারা ভারাক্রান্ত থাকে যে লেখক ও পাঠকের মধ্যে ভাবৈক্যনিময় প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।" কিন্তু রসসৃষ্টির উপকরণ হিসেবে এর পরিমিত ব্যবহার যে চলবেই না, শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয়ের এই রকম ইঙ্গিতে অনেকেই সায় দেবেন না এবং এ পন্থা অবলম্বন করলেই যে আবোল-তাবোলের দ্বারাই তাঁর তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হতে পারবে একথাও অনেকেই স্বীকার করবেন না। এই অনেকের দলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও দাবী করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। কারণ তা না হলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নবতম কাব্যগ্রন্থের 'অপঘাত' শীর্ষক কবিতাটীতে (৯২ পৃঃ) পল্লীর অচঞ্চল শান্তির বর্ণনা করে শেষকালে "প্রায় সিনেমা-পদ্ধতিতেই" সোভিয়েট বোমার কথা বোধ হয় আনতেন না।

আশে পাশে ভাঁটি ফুল ফুটিয়া রয়েছে দলে দলে
বাঁকা চোরা গলির জঙ্গলে,
মৃদু গন্ধ দেয় আনি
চৈত্রের ছড়ানো নেশাখানি।

জারুলের শাখায় অদূরে
কোকিল ভাঙ্গিছে গলা একঘেয়ে প্রলাপের সুরে।
টেলিগ্রাম এল সেইক্ষণে
ফিনল্যাণ্ড চূর্ণ হোলো সোভিয়েট বোমার বর্ষণে॥

সানাই—পৃঃ ৯২

আর রবীন্দ্রনাথের প্রমাণ ছাড়াও আমাদের সাধারণ বিচারবুদ্ধি দিয়ে বিচার করে দেখলেও অসঙ্কোচে বলতে পারা যাবে এ পদ্ধতি আমাদের মনে কোন কোন ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই একটী নতুন ভাব জাগাতে সক্ষম হয়েছে এবং সে ভাব নতুন বলে অসার্থক হয় নি—সার্থকই হয়েছে। হঠাৎ-মনে-আসা একটী উদাহরণ দিচ্ছি :

বড়োবাজারের উপল উপকূলে
জনগণের প্রবল স্রোত
উগারিছে ফেনা।

'উপল উপকূলে' শব্দ ক'টী আমাদের মনে 'সাগরিকার' চিত্র জাগিয়ে দেয়। কিন্তু সেই শব্দ ক'টী যখন হঠাৎ বড়োবাজারের পাথরে বাঁধান রাস্তা সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, তখন আমাদের মনে হঠাৎ

একটা ধাক্কা লাগে—আমাদের সংস্কার রূঢ় আঘাতে চূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে হয়, আমরা যারা সহরে বাস করি, তাদের জীবনে সাগরিকার অবকাশ কতটুকু মেলে! আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তৈলেঙ্কা তণ্ডুল আহরণের এমন ঠাস বুনোনি যে তার মধ্যে সাগরিকার প্রবেশ করার মতো রন্ধ্রপথ সহজে মেলে না। তাই যখনই আধুনিক কবিরা সিনেমা cutting এর পদ্ধতি অবলম্বন করবেন তখুনি তাঁরা বরবাদ—এমন কোনও বাঁধাধরা নিয়ম থাকতে পারে না। সেইজন্যেই পূর্ব্বে বলেছি সহজতাই কাব্যের একমাত্র চিহ্ন নয়, আসল সমস্যা রসসৃষ্টি হয়েছে কিনা। যদি নানা তির্য্যক ভঙ্গীতে কাব্যদীপ্তি চমক দিয়ে উঠে, তবে সে তির্যক ভঙ্গী বাহুনীয়ই, বর্জ্জনীয় নয়।

(৬)

শ্রীযুক্ত গুপ্তের নানা টুকরো কথার ভঙ্গী হতে আশঙ্কা হয় তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার প্রকৃত পটভূমিকা বুঝবার চেষ্টা করেন নি। কাব্যের বস্তু-তান্ত্রিক ব্যাখ্যায় তিনি একেবারে নারাজ, কারণ তাঁর মতে এইসব গরম গরম জিনিষ নাড়াচাড়া করলে "কাব্য-কৌশলের মত কবীক্ষ বিষয়" উপলব্ধি ও উপভোগ করা চলে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হতে আরম্ভ করে প্রত্যেক বড় কবিই ইঙ্গিত দিয়েছেন পারিপার্শ্বিকের প্রভাব তাঁদের কবিপ্রতিভার উপরে কতখানি ছাপ ফেলেছিল। চারপাশে যে ঘটনা ঘটে যাচ্ছে সে ঘটনাস্রোতের ছায়া কবিতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে একটুও থাকবে না এমন কবিতা খুঁজে বার করা কঠিন। তাছাড়া কোন একটী বিশেষ কবিতার কথা ছেড়ে দিলেও কাব্যরাজ্যে একটী নতুন ভঙ্গিমার আলোচনা তার সামাজিক পটভূমিকা ছেড়ে করা চলে না, কারণ নতুন যুগের মানুষ কেন নতুন ভাবে ভাবতে সুরু করলো, তার কারণটা একটু খুঁজে দেখা একেবারে পণ্ডশ্রম নয়। সেইজন্য যাঁরা আধুনিক বাংলা কবিতা—অর্থাৎ বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সমর সেনের কবিতার বিরুদ্ধে সমালোচনা করবেন তাঁদের সঙ্গে আমার বিরোধ মোটেই নেই। বরং তারা যে শুধু হালফ্যাশানের ঢেউ সহ্য করে দাঁড়াতে পেরেছেন তার জন্যে তাঁদের প্রশংসাই প্রাপ্য।

যাঁরা বাংলা 'আধুনিক' কবিতার সমালোচনা করবেন, তাঁদের ক'টী কথা বোধ হয় মনে রাখা ভালো। প্রথমতঃ বাংলার "আধুনিক" কবিতা তার পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্য-ভঙ্গিমাকে বাদ দিয়ে বোঝা যাবে না। প্রথম যুগের মত বর্ত্তমানে নতুন প্রচেষ্টার আতিশয্য তত বেশী না থাকলেও এ কবিতা অনেকাংশেই পূর্ব্বতন কাব্য-রীতির প্রতিক্রিয়াতে রচিত। সেইজন্য হয়তো পূর্ব্বতন কাব্যরীতির যে অংশ এখনও ভালো—অর্থাৎ আধুনিক পাঠকের রুচিবোধ পরিতৃপ্ত করতে পারে—সেগুলিও পরিত্যক্ত হচ্ছে। কাব্যামোদীর পক্ষে যদিও এটী সুখবর নয়—এবং এর বিরুদ্ধে লেখনীচালনা অবশ্য কর্ত্তব্য—তবুও মেনে নিতে হবে প্রত্যেক কাব্যরীতির জন্মের সময় এ যন্ত্রণা থাকবেই। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে এ যন্ত্রণার ফলে কবিতার অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে তা না হলে তার কোনও সার্থকতা নেই।

দ্বিতীয়তঃ এই "আধুনিক" কবিতা অনেকাংশে প্রতিক্রিয়া বশে রচিত বলে তার অধিকাংশই

নেতিবাচক ; তার মধ্যে ভাঙার কাজই বেশী, গড়ার কাজ খুব কম বললেও অত্যুক্তি হবে না। রবীন্দ্রনাথের একটী আকস্মিক মন্তব্যে এই কথাটী উদ্‌ঘাটিত হয়েছে :—

সেই মেয়ে
নহে বিংশ শতকিয়া
ছন্দোহারা কবিদের ব্যঙ্গহাসি-বিহসিত প্রিয়া।
সে নয় ইকনমিক্‌স্-পরীক্ষা বাহিনী।

(সানাই—৮১ পৃষ্ঠা)

পূর্ব্বোক্ত কারণেই 'আধুনিক' কবিদের ছন্দের উপর বিরাগ এত বেশী, এত বেশী ব্যঙ্গহাসির প্রাধান্য। হয়তো অনেক সময়েই ব্যঙ্গহাসি ছাড়া তাঁদের অন্য বক্তব্য কিছু নেই-ই—সেই ভাঙার কাজে লাগানোকেই কবিরা কাব্যের সার্থকতা মনে করেন। এতে শঙ্কিত হবার বিশেষ কারণ আছে বলে মনে করি না। যে বিদগ্ধ সমালোচককে সাধারণের রুচি নিয়ন্ত্রণের ভার নিতে হবে তাঁর লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন এই ভাঙার কাজে গড়ার পথ প্রশস্ত হয়ে উঠছে কিনা। কিন্তু এই ভাঙার কাজ সুরু হবা মাত্রই কাব্য-লক্ষ্মীর ইমারত চিরকালের মত ধূলিবিলীন হয়ে গেল এ ধারণা পোষন করলে মানুষের সৃজনী প্রতিভাকে অস্বীকার করা হবে—ধরে নিতে হবে, এতকাল যে মানুষ যুগে যুগে পুরানো ভেঙে তার উপর নতুন গড়েছে সে প্রতিভার নবোন্মেষ চিরকালের মত বন্ধ হয়ে গেছে এবং এবার ভাঙার পর নতুন করে বুঝি আর কিছু গড়ে উঠবে না।

বাস্তবিকপক্ষে আমাদের সমাজে ইদানীং আমরা যে যে চিহ্ন লক্ষ্য করছি তাতে কাব্যের এই রূপগ্রহণ খুব অস্বাভাবিক বোধ হয় নয়। এর মধ্যে কতটুকু স্বতঃস্ফূর্ত্ত কতটুকু মেকী বারান্তরে তার বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা রইল। সংক্ষেপে বলা চলতে পারে 'আধুনিক' কবিতা কিছু বছর আগেকার কবিতার মত মনে করে না যে কেবল মানব-হৃদয়ের চিরন্তন গুণ (eternal virtues) গুলিই কাব্যের বিষয় হতে পারবে বা কবিতার আলোচ্য বস্তু সব সময়েই 'মহৎ' বা 'সুউচ্চ' (যাকে ইংরাজীতে 'grand' বলা চলতে পারে) হবে। বর্ত্তমানকালে 'আর কোন কাজ নয়' বলে কবিতা কল্পনালতা নিয়ে বসবার অবসর আমাদের প্রায়ই ঘটে ওঠে না। সেকারণ কাব্যলক্ষ্মীর আবাহনের জন্য যদি আমাদের সর্ব্বকর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে হত, তাহলে এই বস্তু-তান্ত্রিক যুগে কাব্যলক্ষ্মীর ক্ষতির পরিমাণটাই বোধ হয় বেশী ঘটতো, কারণ সে অবস্থায় বৎসরান্তে চারটী দিনের পুজাও তাঁর কপালে হয়তো জুটতো না। তাই কাব্য-লক্ষ্মীকে বর্ত্তমানে একটু হিসেবী হয়ে কাজের ভিড়ের সঙ্গে আপোষ রফা করতে হয়েছে। তাতে হয়তো পাঠক সমাজে তাঁর আসন সুদৃঢ়ই হয়েছে, যদিও এ আপোষ রফার অপমানের চেয়ে উপবাসই ভাল—কোনও সমালোচক একথা বললে আমরা একেবারেই নাচার।

বিমলচন্দ্র সিংহ

সঙ্গীত

রাগ ও কেন্দ্রীয়তা

হাতের কাছে যা পায়, মানুষের মন তাকে সাজাতে চায়। দৃষ্টি বা ধ্বনি দ্বারা গৃহীত জগৎ সবটাই স্পষ্ট নয়, তার অনেকখানিই নীহারিকার মতো আবছায়ায় ভরা। তবু এই বিপর্য্যস্ত অনুভূতি সুশৃঙ্খলিত করায় মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই। বিভিন্ন প্রকার ছক (pattern, figure) দিয়ে আমরা দৃশ্য ও শ্রাব্যকে মার্জ্জিত ও সুনিয়ত করি, আশেপাশের ঝাপসা আবেষ্টন নানা নক্সা ও রূপকৃতিতে প্রভাবিত ও কান্ত হয়ে ওঠে। এই প্রবৃত্তিই আকাশে এলোমেলো ছড়ানো তারায় 'কালপুরুষ' বা 'সপ্তর্ষিমণ্ডলে'র সন্ধান দেয়। ধ্বনিলোকে রাগের ক্ষেত্রে কোন দীপ্তিমান ছক বা স্বরবিন্যাসকে কেন্দ্র করে অন্যান্য স্বরসংহতি সুসমঞ্জস রূপ ধারণ করে। কিন্তু আধুনিক সঙ্গীতে এই কেন্দ্রানুগতা হয় বিস্তারিত নয় অতিক্রান্ত হওয়ার সূচনা দেখা যায়, কারণ বিশৃঙ্খলা আজ সুসমন্বয় স্বরাজ্যের দাবী পাঠিয়েছে।

কেন্দ্রত্ব নানা ভাবে ও অজুহাতে আবির্ভূত হয়। ভারতীয় রাগগুলিতে যে মুখ্য স্বরবিন্যাস পাওয়া যায়, একটু খোঁজ করলে ধরা পড়ে সেগুলি বহু স্থলে গ্রামগীতি থেকে নেওয়া। খামাজ, কাফি, ভৈরবী, গারা, পিলু, ঝিঁঝিট, তিলককামোদ প্রভৃতি ঠুংরীজাতীয় রাগে এর প্রভাব দীপ্যমান এবং জয়জয়ন্তী, দেশকার, কলিংগড়া, পরজ, গৌরী, সারঙ্গ ইত্যাদি রাগের প্রকৃতি কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ মনে পর্য্যালোচনা করলে এর স্বাক্ষর পাওয়া শক্ত হবে না। লোকপ্রিয় সুর মুখে মুখে পরিভ্রমণ করে, ভালো লাগলে লোকে মনে রাখে, অপছন্দ হলে নিরুদ্বিগ্নচিত্তে ভুলে যায়। নির্ব্বাচনটা কঠোর বলেই তার রসাঞ্জন এতকাল উজ্জ্বল থাকে। সুতরাং কেন্দ্রানুগতা এখানে উপস্থিত সুপরিচিতির কল্যাণে। যা ভালো লেগেছে, যাকে চিনি, তাতে লোকে নির্ভয়ে তৃপ্ত হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এবং শতকরা নিরানব্বুই জন শ্রোতা এই শ্রেণীর বলে সাধারণ মনোভাবে এর গুরুত্ব অপরিমেয়।

রাগের গঠনে আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বিশিষ্ট স্বরবিন্যাস ছাড়া কতকগুলি স্বরে আভিজাত্যের প্রবণতা থাকে এবং যেহেতু এগুলিতেও আর এক প্রকার কেন্দ্রীয় প্রাধান্য আরোপিত হয়। বিশিষ্ট স্বরবিন্যাসকে সাঙ্গীতিক পরিভাষায় 'পকড়' এবং কৈশ্রিক স্বরগুলিকে 'অংশ' বা 'মুকাম' বলতে পারি (এদেরই দুটি 'বাদী', 'সংবাদী' অভিহিত হয়)। 'ইমন' রাগে "নিরেগরে, স, পম (তীব্র) গ, রে, স" কে পকড় এবং 'স, গ, প, নি' কে অংশস্বর রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

রাগে দুটি স্বর 'বাদী', 'সংবাদী' রূপে স্বীকৃত হয়। সর্ব্বপ্রথম বাদী, সংবাদীর ঐকান্তিক প্রাধান্যে সংশয় জ্ঞাপন করেন 'গীতসূত্রসারে' (১৮৮৫) কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু বাদী সংবাদী ব্যতিরিক্ত স্বরের গুরুত্ব উপলব্ধি করেও রাগে স্বরগত প্রাধান্য উপেক্ষা করতে না পেরে

বাদী সংবাদী সংজ্ঞা ব্যবহার করতে বাধ্য হন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তাঁর পদ্ধতিতে বাদী সংবাদীকে বিশিষ্ট স্থান দিয়েছেন। বস্তুতঃ বাদী সংবাদী নামক দুটি স্বর ছাড়া অন্যান্য স্বর প্রবল হতে পারে, যেমন ইমনের বাদী সংবাদী 'গ' ও 'নি' হলেও 'স' ও 'প' সমানই মর্য্যাদা পায়। এ সমস্যার নিষ্পত্তি খুব কঠিন নয়, কারণ শাস্ত্রে বাদী সংবাদী নামক দুটি কথার সামান্য উল্লেখ থাকলেও রাগের বর্ণনায় মুখ্য স্বরগুলি সর্ব্বদা 'অংশ' বলে অভিহিত হয়েছে এবং এদের এক বা একাধিক যে কোন সংখ্যা হতে পারে। তার ওপোর যতদূর বোঝা যায় বাদী সংবাদীর মুখ্য অর্থ ছিল সম্ভবতঃ ধ্বনির সামঞ্জস্য (consonance)। সুতরাং উপায়ন্তর না দেখে শাস্ত্রোক্ত নজির অনুযায়ী আমি প্রস্তাব করি 'বাদী সংবাদী' সংজ্ঞা তুলে দিয়ে মুখ্য স্বরগুলিকে 'অংশ' নাম দিলে রাগও বাঁচে, শাস্ত্রও ভাঙে না ; গায়কীয় ঐতিহ্যে প্রচলিত 'মুকাম' অথবা আশ্রয়স্থান বাচক একটি হিন্দুস্থানী উপযোগী শব্দ কথ্যভাষায় ব্যবহৃত হতে পারে (বাদী সংবাদী সম্বন্ধীয় বাদবিসংবাদ লেখকের Problems of Hindustani Music-এ দ্রষ্টব্য)।

এতে নিস্তার পাওয়া গেলে নিশ্চয় সুবিধে হত, কিন্তু কার্য্যকালে আব্দুল করিম যখন ইমন রাগে তীব্র মধ্যম বা তথাকথিত একটি অপ্রধান স্বরকে মুখ্য করে অবলীলাক্রমে সুমিষ্ট রাগবিস্তার করেন, তখন বিলক্ষণ সন্দেহ হয় স্বরের কেন্দ্রীয়তা গায়কের ইচ্ছাধীন কিনা। অংশ স্বরের পক্ষে এইটুকু বলা যেতে পারে যে রাগের স্বাভাবিক গতি এদের কেন্দ্র করে আবর্ত্তিত হয়, কিন্তু প্রতিভাষিত শিল্পী যে কোন স্বরকে আশ্রয় করে রাগবিকাশে সক্ষম (লেখকের পুস্তকে এই প্রণালী দ্বারা উদ্বুদ্ধ 'দেশ' রাগের বিস্তার আছে)। ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় সঙ্গীতে সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্রীয় স্বর হল 'স' বা 'ষড়্‌জ' (tonic, key-note) এবং শাস্ত্রে ষড়্‌জ পরবর্ত্তী ছয়টি স্বরের জনক রূপে বর্ণিত। পাশ্চাত্য পদ্ধতিক্রমে অন্য স্বর অবলম্বন করে (modulation) দুটি মূল 'স্কেলে'র (major and minor) আবির্ভাব হতে পারে। সুতরাং কোন স্বরের বিশিষ্ট ও একমাত্র কেন্দ্রত্ব না ভারতীয় না ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে স্বীকৃত।

কিন্তু সাঙ্গীতিক কেন্দ্রীয়ত্ব পাশ্চাত্যে শুধু ব্যাপক ও বিস্তারিত হয়ে ক্ষান্ত নেই, সেখানে কেন্দ্রীয়তা সম্যক অস্বীকার করে সঙ্গীত রচনারি আধুনিক ও অভিনব পরীক্ষা চলেছে। ইয়োরোপে Anton Webern (জন্ম ১৮৮৩) এবং Alban Berg (১৮৮৫—১৯৩৬)* সঙ্গীতে কেন্দ্রবিমুখতার পুরোধা। এইখানে প্রশ্ন ওঠে সঙ্গীতে কেন্দ্র-সম্পর্ক-শূন্য রচনা সত্যি সম্ভব কিনা। কোন প্রকার কৈন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণ বা শৃঙ্খলা না থাকলে রুচির সায় পাওয়া শক্ত এমনিই মনে হয়। হয়ত এমন কোন শৃঙ্খলা অনুসৃত হয়েছে যাতে কেন্দ্রত্বের অর্থ ব্যাপকতর। চূংরীতেও যেমন খুসী রচনা আরব্ধ, কৈন্দ্রিক বিপ্লব সেখানে অদূরসম্ভাবী। রাগসঙ্গীত গায়কের

* এই প্রণালীর প্রবর্ত্তক হলেন Schonberg (Vienna, 1874). Eccentric Austrian composer, until 1894 self-taught, then pupil of Zemlinsky. His gifts of technical ingenuity and imagination are indisputable, though many of his attempts to expand structural procedure in novel ways seem more bizarre than successful.

—Pratt. Encyclopædia of Music.

পক্ষে পাশ্চাত্য রীতির এত সূক্ষ্ম বিচার অহমিকা, তবু আর একজন এই শ্রেণীস্থ রচয়িতার মতামত মনে হয় এস্থলে অপেক্ষাকৃত সুযৌক্তিক।

"Paul Hindemith (জন্ম ১৮৯৪) also evolved a system which has been called Atonal (কেন্দ্রাপসারি) But he himself repudiates the word as applied to his music. There is, as he points out, a clearly defined tonal centre, or series of tonal centres, in all his music, which is very personal and differs unmistakably from that of atonalists in every respect but one."

সমস্ত সৃষ্টির মূলে রয়েছে মননশক্তি। সঙ্গীতক্ষেত্রে দীর্ঘকাল মনশ্চারণ করার ফলে সঙ্গীতাই সৃষ্টির সীমা ভাবতে শেখা মানসিক অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়। পরিধি সপ্রসারিত হলে পরিচিত শৃঙ্খলার অদর্শনে একটা অসহায় ভাব আসে। চিন্তার নানা রাজ্যে যে স্বেচ্ছাচার চলেছে, তার সুদূরান্তে স্বরগত নৈরাজ্যে তুষ্ণীম্ভাবিত হওয়াই শ্রেয়ঃ, তবু নির্জ্জনা বিশৃঙ্খলা পরিপাক করা কঠিন। তা যদি হোত বারটি স্বর লটারির টিকিটের মত নির্ব্বাচিত হয়ে মহান সঙ্গীত সৃষ্টি করত। পারিপার্শ্বিকের অপ্রিয় অনেক কিছু এতদিন অস্বীকার ও অবহেলা করে এসেছি, তাদের ছুনিবার আর্জ্জি আজ মানা মানতে নারাজ। সঙ্গীত ও মানুষের চিন্তায় অঙ্গীভূত হয়ে বৃহত্তর সামঞ্জস্য ও পরিণতির শক্তিতে তারা মানবজীবন সমৃদ্ধ করবে এই আশাই মনে জাগে। আধুনিক সাহিত্য থেকে সহধর্ম্মী ধারার সাক্ষী একটা ধ্বন্যাত্মক উপমা দেওয়া যেতে পারে :

"the jungle rock and the bass gugglebooming against the contralts and the ringaringaling and the zzzzzzzz and the vowels a and e and the umlant and the incantation and the germanic deepnote and the hollow click and the junglelaughter and the tintune and the goldwhistle and the sibilant chestsound."

উদ্ধৃত অসংলগ্ন বাক্য সমষ্টিতে গুরুগাম্ভীর্য্যের ও ভয়াবহত্বের ব্যঞ্জনা রয়েছে, তবু এইটুকু সম্বলে কোন সাহিত্য মহৎ ও স্থায়ী হয় না। অন্তরতম অভিজ্ঞতার শিল্পীসুলভ আবেদনে কারুস্বজন স্থিতিশীল। তাই বলে যে নতুন আঙ্গিকের উন্মেষ ও আভাস এই সব পরিকল্পনায় রয়েছে, তার মূল্য ও পোষণের শক্তি মিছে নয়। প্রতিভার ঐশ্বর্য্য স্বীকরণে, উপাদানের কোন বিশেষ অংশাবলম্বী ঐকান্তিক কেন্দ্রমুখীতা এ যুগে অধর্ম্ম।

হেমেন্দ্রলাল রায়

সিনেমা

অমর-গীতি : ফিল্ম কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া।
অভিনেত্রী : নিউ থিয়েটার্স।
ঠিকাদার : শ্রীভারতলক্ষ্মী।

সম্প্রতি এখানে হিন্দী ছবির জনপ্রিয়তা এমনি ভীষণ হয়ে উঠেছে যাতে স্বভাবতই মনে হয় যে বাংলা দেশে বুঝি এখন আর বাংলা ছবি তৈরী হয় না। বাঙালী দর্শকেরা কে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষাকে আয়ত্তে আন্‌বার তাগিদেই হিন্দী ছবির দিকে ঝুঁকে পড়ছেন তা নয়। ছবি হিসেবেই আজকাল হিন্দী ছবি বাঙালীদের মনে ভালো লাগ্‌ছে। তার কারণ রহস্যাচ্ছন্ন নয়, অত্যন্ত স্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল। হিন্দী ছবিতে গল্পকে চিত্রোপযোগী করে নেওয়া হয় সহজ সরল পথে, দর্শকের ইচ্ছাপূরণ যাতে পূর্ণমাত্রায় হতে পারে। হিন্দী ছবির অভিনয়, চিত্র ও শব্দগ্রহণ চলনসই, গান উৎকৃষ্ট। অবসর সময় এ নিয়ে খুব ভালো ভাবেই কাটানো যায়, সবাই আর কিছু বুদ্ধি এবং সংস্কৃতিতে শাণ দেবার জন্যে ছবি দেখ্‌তে যায় না। অবশ্য তাই বলে একথা ভাবা অন্যায় হবে যে বাংলা ছবি সংস্কৃতির চাপেই মারা গেল—বাংলা ছবিও গল্পে, গানে বা আঙ্গিকে কোনো অসাধারণত্ব উপস্থিত করে না, তার গঠন পদ্ধতিই মারাত্মক। শরৎচন্দ্রের 'দত্তা'র বাংলা চিত্ররূপ শোচনীয় পরিণতি লাভ করেছে অথচ দত্তা থেকেই উপাদান নিয়ে যে হিন্দী চিত্র 'বন্ধন' তৈরী হল তাতে বাঙালী দর্শকের ভীড় অসম্ভব রকম। এর অর্থ এই যে হিন্দী-চিত্রপরিচালক একটি গল্পকে যতটুকু বোঝেন ঠিক ততটুকুই চিত্রে রূপায়িত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন আর বাংলা-চিত্রপরিচালক গল্পকে যতটুকু বুঝবার ভাণ করেন তার এক তৃতীয়াংশও চিত্রে পরিবেশন করতে পারেন না। বাঙলা চিত্রে উন্নাসিকতার আভাস আছে, নেই তার সার্থক পরিচয়।

'অমরগীতি' একটি বাংলা চিত্র—টেলিভিশনের অপূর্ব মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে যার আরম্ভ,—তাই সময়কে দশবছর এগিয়ে দিয়ে তার পারিপার্শ্বিক তৈরী হয়েছে। কিন্তু এখন্‌ হতে দশবছর পরেও দেখতে পাচ্ছি অশীতিপর বৃদ্ধের কাছে জোর করে একটি ষোলো-সতেরো বছর বয়সের মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হয়, ননদ বৌকে মারধোর করে, সিগার-কে রিভলবার ভ্রমে মানুষ ভয় পায়। দশ বছর পর শুধু বিজ্ঞানের উন্নতিই বাংলা দেশকে স্পর্শ করে যাবে আর সমাজ থাক্‌বে পিছিয়ে, অস্বাভাবিক এ কল্পনাকে কোনো দর্শকের মনই প্রশ্রয় দিতে সহজে রাজি নয়। টেলিভিশনে দুঃসাহস দেখিয়ে বিজ্ঞানাজ্ঞ লেখক এবং পরিচালক শব্দকে ইথার-বাহী বলে যে প্রচণ্ড বৈজ্ঞানিক ভুল করেছেন তা-ও হয়ত সহ্য করা যেতো যদি না টেলিভিশনে নিওন-সাইনের একটা গ্রাফ আর স্পেক্ট্রাম-বোর্ডে প্রণবধ্বনির বাংলা চিত্ররূপ সগৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ত।

তারপর তাঁবু খাটিয়ে, রেষ্ট্‌রেণ্টের চেয়ার সাজিয়ে তাতে দশ-বারো জন কৃসজ্জিত এক্সট্রা-কে বসিয়ে দিয়ে দশবছর পরের বৈজ্ঞানিক-সম্মেলনের যে একটি অপূর্ব সেট্ পরিচালক দর্শকের দৃষ্টিপথে উপস্থিত করেছেন কোনো চতুর্থ শ্রেণীর চিত্রেও তেমন দুঃস্থ দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না। কাজেই 'অমরগীতি'কে যদি দর্শকের মন এবং কল্পনা গ্রহণ করতে না পারে তাতে দুঃখ করবার কিছুই নেই।

তেম্নি 'অভিনেত্রী' ছবিটির অসাফল্যে শিল্প-পিপাসুদের আনন্দিত হবার কারণ আছে। এতে শিল্প বা সমাজ্‌ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, আছে কেবল একজন অভিনেত্রীর নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রেমকাহিনী—তাও অপটু হস্তে পরিবেশিত। এ প্রেমকাহিনী নিয়েও যে সার্থক চিত্র তৈরী করা চলে না এমন নয়। দর্শকের আশা-আকাঙ্ক্ষা অগাধ মনে করা অন্যায়, কতকগুলো মৌলিক অনুভূতির যথাযথ স্ফুরণ দেখ্‌তে পেলেই তারা খুশী। যেহেতু অভিনেত্রীও সামাজিক জীব—তার জীবন থেকে এ-সব অনুভূতি আহরণ করে ঘটনার সংঘাতে তাদের প্রগাঢ় করে তোলা যায়। কিন্তু লেখক কেবল ভেবেছেন নায়ক-নায়িকার বিয়ের কথা আর পরিচালক ভেবেছেন তাদের দিয়ে কেবল গান গাওয়াবার কথা। কাহিনীর নায়ক এবং নায়িকা বাংলা রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং অভিনেত্রী। অথচ রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যগুলোতে বিভিন্ন ভূমিকা-অভিনয়ে নায়ক-নায়িকা যেরূপ নিকৃষ্ট অভিনয়ের নমুনা দেখিয়েছেন তাতে দর্শকের মন গোটা ছবিটার উপরই বিরূপ হয়ে উঠ্‌তে বাধ্য। It Happened One Night ছবিটি থেকে একটি দৃশ্য আত্মসাৎ করে পরিচালক হয়ত ভেবেছিলেন যে পরিচালনার একটা অপূর্ব চমক লাগিয়ে দেবেন, কিন্তু তা করে তিনি এইমাত্র প্রমাণ করেছেন, অনুকরণ করবার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত তাঁর আয়ত্তে নেই।

একমাত্র 'ঠিকাদার' ছবিটিতে দর্শকদের প্রতি খানিকটা সুবিচার করা হয়েছে দেখা যায়। কাহিনীটি জটিল গ্রন্থি-বর্জ্জিত অথচ দর্শকের আগ্রহ তাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়নি। তাছাড়া চা-বাগানের পারিপার্শ্বিকটা নূতন বলে নয়, সুন্দরভাবে গ্রহণ করা হয়েছে বলেই মনোরম। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'ঠিকাদার'কে ভালো ছবি বলা চলে না। নায়কের প্রতি অন্যায়ের উদাহরণ স্বরূপ বনের যে একটি বিচার-দৃশ্য যোজনা করা হয়েছে ছেলেমানুষেমি ছাড়া তাতে আর কিছু নেই। প্রতিশোধ নেবার দৃশ্যেও কাহিনীকার নায়কের মনস্তত্ত্ব নিয়ে হাস্যকর হয়ে উঠেছেন। সংলাপ রচনাকারীর যে বাংলা ব্যাকরণের অতিসাধারণ জ্ঞান পর্য্যন্ত নেই তারও একাধিকবার পরিচয় ছবিটিতে পাওয়া যাবে। এবং সর্ব্বোপরি মারাত্মক ব্যাপার নায়কের কু-অভিনয়। যে কোনো সার্থক হিন্দী ছবির মত দর্শক আকর্ষণের উপাদান 'ঠিকাদার'র ছিল, এমন কি যে-বস্তুতে বাঙালী দর্শকেরা প্রীতি লাভ করতে অভ্যস্ত সেই গানও এতে অপরিমিত এবং সু-গীত, তবু তার আর্থিক সাফল্য তেমন কিছু হয়নি; তার কারণ লেখক এবং পরিচালক ছবিটিকে দর্শকের মনের পথে বরাবর চালিয়ে নিতে পারেন নি।

দর্শকের মনের পথে চল্‌তে চিরপ্রচলিত একটা যুক্তির বাধা আছে। এ-যুক্তিটা সম্ভবত বাংলা দেশেরই আবিষ্কার—বাংলা শিল্প বা বাংলা সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে তাকে অহরহই

প্রয়োগ করতে দেখা যায় : জনসাধারণের রুচি নাকি সাধারণত স্থূল, কাজেই শিল্পের শিল্পত্ব না ঘুচিয়ে জনসাধারণের মনস্তুষ্টি করা চলে না। অন্য শিল্প সম্বন্ধে এ-যুক্তির যৌক্তিকতা আলোচনা করা এখানে অবান্তর, তবে বাংলা ছবি সম্বন্ধে যে এ-যুক্তিই অচল তা অসঙ্কোচেই বলা যায়। প্রত্যেক বাংলা চিত্রে এমন কতকগুলো ভাঁড়ামির সাক্ষাৎ মেলে যা একমাত্র নিরক্ষর জনসাধারণকেই আনন্দ দিতে পারে, স্বল্পশিক্ষিতেরাও তা আপন রুচিগত বলে মনে করবে না। তাই এ কথা বল্‌লে অন্যায় হয় না যে শিল্পসৃষ্টির কথা বাংলা ছবি-প্রস্তুতকারকদের মুখে অশোভন। আর তাছাড়া দর্শকেরা যে কোনো বড় একটা বিষয় বা ভালো কোনো বস্তু গ্রহণ করতে একেবারেই অক্ষম এমন কথা কখনো জোর করে বলা যেতে পারে না। আমরা মনে করি কোনো বস্তু গ্রহণ করা না-করা একমাত্র পরিবেশনের কৌশলের উপরই নির্ভর করে।

সমালোচনা

রবীন্দ্র রচনাবলী—৪র্থ এবং ৫ম খণ্ড (বিশ্বভারতী : প্রতি খণ্ড ৪৷৷০, ৫৷৷০, ৬৷৷০)

রবীন্দ্র রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে গীতি প্রতিভার যে উন্মেষ আমরা লক্ষ্য করেছি, চতুর্থ খণ্ডে তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র প্রতিভার যে বিশিষ্ট সুর কড়ি ও কোমলের সময় থেকেই তাঁর কাব্যরীতিকে স্বতন্ত্র করে তুলেছিল, মানসী, সোনার তরীর মধ্য দিয়ে তার বিকাশ চিত্রায় এসে আরো পরিপূর্ণ। 'নদী' কবিতাটিও এদিক থেকে দেখতে গেলে উল্লেখযোগ্য, কারণ সোনার তরীতে কল্পনার প্রাবল্যে সাধারণ অভিজ্ঞতার যে রূপান্তর, তার ফলে রবীন্দ্র কাব্যের আবেদন সংকীর্ণ হয়ে আসবার আশঙ্কা ছিল। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের মধ্যে ইন্দ্রিয়াতীতের আবির্ভাব সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত ও ক্লান্ত করে ফেলে। তাই রবীন্দ্র কাব্যের এ সঙ্গীতময় রূপে সাধারণ মানুষের মন নিজের অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি নাও পেতে পারে। 'নদী' আমাদের সে আশঙ্কা দূর করে, কারণ এখানে অভিজ্ঞতার ঘরোয়া রূপকে ঘরোয়া ভাবে সাজিয়েই রবীন্দ্র-প্রতিভা পরিপূর্ণ। বহুক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে রোমান্টিক কাব্যের ঐকান্তিক একাগ্রতার মধ্যেই মুমূর্ষতার বীজ লুকোনো, তাই আয়রিশ রোমান্টিক কবিদের বহু রচনা সৌন্দর্য্যের আতিশয্যে মনকে পীড়া দেয়। রবীন্দ্র কাব্য অতীন্দ্রিয়ের প্রলোভনে ইন্দ্রিয়কে কোন দিনই বর্জ্জন করে নাই। তার বিপুল এবং স্থায়ী আবেদনের কারণ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অতীন্দ্রিয়ের সমন্বয়।

'নদী' কবিতাটি আরেক দিক থেকেও রবীন্দ্র প্রতিভার প্রতীক। নদীর সুর এবং সারার মধ্যে তফাৎ অনেক। কেবল দেশদেশান্তরে তার প্রবাহ বলেই যে এ পার্থক্য, তা নয়—পারিপার্শ্বিক, গতি এবং আবেগের রূপান্তরে সে পার্থক্যকে আরো প্রবল করে তুলেছে। এ বিপ্লবী পরিবর্ত্তনের মধ্যেও নদী কিন্তু কোথাও নিজের যোগসূত্র হারায়নি—একই ধারা তার সমস্ত জীবনকে গ্রথিত করে রেখেছে। রবীন্দ্র প্রতিভারও একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে দেশ, কাল, পারিপার্শ্বিক ও গতির সঙ্গে সঙ্গে তার রূপ বদলিয়েছে, কিন্তু সে পরিবর্ত্তনের মধ্যে কোথাও ছেদ নাই। রবীন্দ্র প্রতিভার বিস্ময়কর বিবর্ত্তনও তাই আকস্মিক নয়—রবীন্দ্রনাথের জীবনসূত্রে তা দৃঢ়ভাবে গ্রথিত।

ইন্দ্রিয়জের সঙ্গে অতীন্দ্রিয়ের সমন্বয় চিত্রার মর্ম্মকথা। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথের বহু গুণগ্রাহীর মতে চিত্রা রবীন্দ্র প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। ও সম্বন্ধে মতভেদ স্বাভাবিক। কিন্তু চিত্রায় যে রবীন্দ্র প্রতিভা স্বধর্মে প্রথম প্রতিষ্ঠিত, এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। পরিচিত পৃথিবী সোনার তরীতে কল্পনার বেগে টলে উঠেছে—নিরুদ্দেশের আহ্বানে তার অধিকাংশ কবিতা চঞ্চল, এমনকি ব্যঙ্গ কবিতাগুলিও আবেগের প্রাবল্যে দোলায়মান। চিত্রায় সে

আবেগ জমাট বেঁধে এসেছে, তাই অতীন্দ্রিয়ের সৌন্দর্য্যানুভূতি সমান প্রখর। কিন্তু অতীন্দ্রিয়ের আহ্বানে অজানা পৃথিবীর অভিসারের আর কোন প্রয়োজন নাই। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' যেভাবে সোনার তরীর প্রতীক-কবিতা. 'যেতে নাহি দিব' বা 'বিজয়িনী' ঠিক সেই ভাবে চিত্রার মর্ম্ম কথা তুলে ধরেছে। পরিচিত পৃথিবীকে অতিক্রম করবার প্রয়োজন নেই, কারণ পরিচিত পৃথিবীর বর্ণস্বাদগন্ধ অতীন্দ্রিয়ের আবেদনে পরিপূর্ণ। 'বসুন্ধরা,' 'মানস সুন্দরী'—এ সমস্ত কবিতাগুলিই এই নতুন সমন্বয়ে সমৃদ্ধ। আঙ্গিক বা টেকনিকের দিক থেকেও চিত্রার এইখানে শ্রেষ্ঠত্ব, কারণ কবির মনের দ্বন্দ্ব অনেকখানি নিরসন হয়েছে।. পরিচিত পৃথিবীর মধ্যে অপরিচিতের গৌরব তাঁর দৃষ্টিকে আর উদ্‌ভ্রান্ত করে না, বরং নতুন গভীরতা ও স্থৈর্য্য এনে আঙ্গিকের দিকে লক্ষ্য দেবার সুযোগ রচনা করে দেয়।

বিদায় অভিশাপকে নাটক বলা হয়তো চলে না—কিন্তু কাব্যনাট্য হিসাবে রবীন্দ্র সাহিত্যে তার স্থান সুনির্দ্দিষ্ট। তারও মর্ম্মকথা পরিচিত পৃথিবীর সঙ্গে অপরিচয়ের আবেদনের সমন্বয়। এক দিকে দেবযানীর অসামাজিক এবং অসাধারণ প্রেমের আবেদন—অন্যদিকে সমাজ ও সংসারের সাধারণ কর্ত্তব্যের আহ্বান। কচ তারি মধ্যে আপনার কর্ত্তব্য বেছে নিল। কিন্তু সাধারণকে স্বীকারের মধ্যে অসাধারণের প্রতি কোন অস্বীকার নাই। নিয়তির লীলাই এই যে মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষা মিটতে পারে না, কিন্তু যে আশা অপূর্ণ রইল, হৃদয়ের কাছে তার মূল্য তাতে বাড়ে বই কমে না।

বাস্তবকে স্বীকারের এ সাধনা রবীন্দ্র রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডেও নতুন রাজনৈতিক অনুভূতির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। চতুর্থ খণ্ডে সে অনুভূতি আরো প্রবল হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষ বা চরিত্র পূজায় এ নতুন রাজনৈতিক বোধ প্রবল। প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক অনুভূতির বৈশিষ্ট্য এই যে কেবলমাত্র প্রতিবাদ বা সমালোচনার মধ্যে তা বদ্ধ থাকেনি। ইংরেজ যে বহু ভাবে এ দেশের গ্লানির জন্য দায়ী একথা নিঃসন্দেহ। এমন কি ভারতীয় চরিত্রের অবনতির জন্যও ইংরেজ রাজনীতি অনেক ক্ষেত্রে অপরাধী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেজন্য কেবল ইংরেজের সমালোচনা করে ক্ষান্ত হন নি। তাঁর বক্তব্য এবং চেষ্টা এই যে ভারতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতার যে রন্ধ্রপথে এদেশে শনির আবির্ভাব, তাকে বন্ধ করতে হলে কেবল অন্যের সমালোচনায় চলবে না। তার জন্য প্রয়োজন আত্মবিচার এবং চরিত্র পূজা। পরে যে সাধনা স্বদেশী আন্দোলন ও শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করেছিল, ভারতবর্ষ এবং চরিত্রপূজার প্রবন্ধগুলিতে তারই উন্মেষ স্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের শৈশব সংসারের কোলাহল ও দ্বন্দ্ব থেকে দূরে কেটেছে, কিন্তু তাঁর জীবনের পরিণতি ধীরে ধীরে তাঁকে মানুষের সাধারণ সুখদুঃখ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছে। রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডে 'চৈতালী' এই কথাই আমাদের বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয়। চৈতালীর সাধনা সহজের সাধনা। যে সমস্ত ছোট ছোট কাজ, ছোট ছোট কথা এবং ছোট ছোট অনুভূতি নিয়ে আমাদের জীবন, কাব্যে তাদের রূপ দেবার সাধনা চৈতালীকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন যে বাইরের পৃথিবীর আকস্মিক আবির্ভাবে

চৈতালী অপ্রত্যাশিত ভাবে ফুটে উঠেছে। অল্প পরিধির মধ্যে স্পষ্ট করে দেখেছিলেন বলে চৈতালীতে অলঙ্কার প্রয়োগেরও কোন চেষ্টা নেই—চৈতালীর ভাষা এত সহজ হয়েছে এই জন্যেই। এ কথাগুলির সবই মেনে নেওয়া যায়, কেবল 'চৈতালী'কে অপ্রত্যাশিত ভাবতে বাধা লাগে। কারণ রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহে দুইটী বিপরীত ধারা ও তাদের সমন্বয়ের চেষ্টা সর্ব্বত্রই চোখে পড়ে। একদিকে অসাধারণ ও অতীন্দ্রিয়ের আবেদন এবং অন্যদিকে অতি সাধারণ ও সহজের স্বীকৃতি—এই দুই ধারার মধ্যে রবীন্দ্র প্রতিভা নিজেকে খুঁজে ফিরেছে। কখনো বহির্বিমুখী আহ্বান প্রবলতর এবং নতুনের টানে রবীন্দ্রকাব্য চঞ্চল ও দুর্ল্লভ। কখনো সাধারণের স্বীকৃতিতে রবীন্দ্রকাব্য সহজ এবং মন্থর। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যে কোন ধারাই একাধিপত্য করতে পারেনি, এবং পারেনি বলেই রবীন্দ্রপ্রতিভা আমাদিগকে এতখানি টানে। কেবলমাত্র অতীন্দ্রিয়ের আহ্বান মনকে চঞ্চল করে তোলে বটে, কিন্তু তার পরিসমাপ্তিতে আসে ক্লান্তি এবং অবসাদ। কেবলমাত্র সহজ ও পরিচিতের আবেদন মনকে সান্ত্বনা দেয়, কিন্তু তারও পরিসমাপ্তি অবসন্ন নির্জ্জীবতায়। চৈতালীর কবিতাগুলির মধ্যেও এ দোটানার পরিচয় মেলে। একদিকে নিরাড়ম্বর ও নিরাভরণ সহজ জীবনছবি, অন্যদিকে প্রাচীন ভারতীয় গৌরব ও ঐশ্বর্য্যের বেদনাময় আহ্বান।

কাহিনীতে ঐশ্বর্য্য ও অসাধারণের প্রতি ঝোঁক বেশী, কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য এখানেও সমান স্পষ্ট। সাধারণ ও সহজের মধ্যে অসাধারণের আবির্ভাব তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নাই, অন্যপক্ষে কাহিনীর অসাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্যেও সহজ মানবধর্ম্মের সন্ধানই বারে বারে চোখে পড়ে। সংস্কার ও প্রচলিত রীতির জঞ্জালে মানুষের সহজ প্রাণধর্ম্ম চাপা পড়ে যায়—অকস্মাৎ ঘটনা বিপর্য্যয়ে সেই প্রাণবেগ আবার বিচ্ছুরিত হয়ে উঠে। কাহিনীর অধিকাংশ গল্পগুলি প্রাণবেগের আবির্ভাবে পরিপূর্ণ। সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও প্রচলিত সংস্কারকে আঘাতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কেবল নূতনের আবির্ভাবই দেখেন নাই—পুরাতনের পুনঃপ্রতিষ্ঠাও তার মধ্যে সমান স্পষ্ট।

সংস্কার ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে নৌকাডুবির গল্পাংশ। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়, "স্বামীর সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে-সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে, তার মূল এত গভীর কিনা যাতে অজ্ঞানজনিত প্রথম ভালবাসার জ্ঞানকে ধিক্কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে"। এই সমস্যা নিয়েই নৌকাডুবির প্লট। কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে এ প্রশ্নের সার্ব্বজনীন উত্তর সম্ভব নয়। তবে একথা বলারও হয়তো প্রয়োজন ছিল না, কারণ কোন গল্প বা উপন্যাসই কোন প্রশ্নের সার্ব্বজনীন উত্তর দিতে পারে না—দিতে চেষ্টাও করে না। সাহিত্য ও শিল্পের কারবার ব্যক্তিকে নিয়ে, এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে সার্ব্বজনীনতার যেটুকু অবকাশ, শিল্প তাই নিয়েই তৃপ্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেই হয়তো অনুভব করেছেন যে কমলার চরিত্রে স্বামীশ্রদ্ধা এত প্রবল নয় যে অপরিচিত স্বামীর সংবাদ মাত্রেই সকল বন্ধন ছিঁড়ে সে তার দিকে ছুটে যেতে পারে। বস্তুতপক্ষে, কমলা ও রমেশের প্রণয়ের যে সূক্ষ্ম আমরা দেখি, তার সারা হঠাৎ আকস্মিক ভাবে বদলে গিয়েছে বলেই রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধের উল্লেখ করা

প্রয়োজন মনে করেছেন। নৌকাডুবিতে আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার এই যে, যে সমস্ত চরিত্র অতর্কিতে এসেছে, তারাই স্পষ্টতর হয়ে ফুটে উঠেছে। গাজিপুরের চক্রবর্ত্তী বা অক্ষয় তাই নিজ প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল, এমনকি উমেশও একটা নিজস্ব ব্যক্তিত্বে পরিপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথের সহজের সাধনা এসময়কার গল্প প্রবন্ধে যত স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে, এত স্পষ্টভাবে বোধ হয় আর কোথাও ফোটে নাই। বিচিত্র প্রবন্ধে আমরা রবীন্দ্রনাথের মানসলীলার এক নতুন বিকাশ দেখি। বক্তব্য যে খুব অসাধারণ বা গভীর তা নয়, কিন্তু বলবার ভঙ্গীতে তা উজ্জ্বল এবং মধুর হয়ে উঠেছে। পঞ্চভূতে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা লঘু সাহিত্যের প্রথম পরিচয় মেলে, বিচিত্র প্রবন্ধে সে ধরণের হালকা রচনায় রবীন্দ্রনাথের হাত আরো পেকেছে। 'বাজে কথা', 'পনেরো আনা' প্রভৃতি অনেক রচনারই মূলকথা সহজ, কিন্তু এমন লালিত্যের সঙ্গে সে কথা বলা হয়েছে যে তার মাধুর্য আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করে। সভ্যতার লক্ষণই এই যে প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনীয়ের অনুপাত বেড়ে যায়—বিচিত্র প্রবন্ধ জীবনের অপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলিরই জয় গান।

প্রাচীন সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ নতুন সমালোচনা রীতিও পত্তন করেছেন। বাংলার সমালোচনা সাহিত্য আজও অতি দরিদ্র—রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য যে ধারার প্রবর্তন করেছিল, আজও তা পূর্ণতা লাভ করেনি। সমালোচক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা পরে করবার ইচ্ছা আছে।

রবীন্দ্র রচনাবলীর খণ্ড বিভাগ সম্বন্ধে একটী কথা বলা প্রয়োজন। প্রত্যেক খণ্ডেই গদ্য পদ্য গল্প নাটক দেবার পরিকল্পনায় রবীন্দ্রপ্রতিভার বিকাশ ঠিক ধরা পড়ে না। প্রতি খণ্ডেই বিভিন্ন সময়ের রচনা স্থান পেয়েছে, তাই ধারাবাহিক ভাবে রবীন্দ্রপ্রতিভার বিচার করা কঠিন হয়ে ওঠে। খণ্ড খণ্ড ভাবে গ্রন্থগুলির সমালোচনা করেও বিশেষ কোন লাভ নেই কারণ গ্রন্থগুলি পূর্ব্বেও সমালোচিত হয়েছে, এবং সাময়িকির ক্ষুদ্র কলেবরের মধ্যে প্রতি খণ্ডের বিশদ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। রচনাবলীর সমস্ত খণ্ডগুলি প্রকাশিত হলে রবীন্দ্র প্রতিভার বিকাশ ও ধারা নিয়ে আলোচনা চলতে পারে, অথবা কেবল কাব্য বা গদ্য রচনারীতির পরিবর্ত্তনগুলির বিচার সম্ভব। বর্ত্তমানে যে ভাবে খণ্ডগুলি বের হচ্ছে, তাতে দুটো পথই বন্ধ, এবং সমালোচনা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে বাধ্য।

অপ্রচলিত রচনা সংগ্রহের ১ম খণ্ডও বেরিয়েছে। দু খণ্ডে তা সমাপ্ত হবার কথা। ২য় খণ্ড বেরোলে একসঙ্গে সমস্ত অপ্রচলিত রচনা নিয়ে আলোচনা বারান্তরে করবার ইচ্ছে রইল।

হুমায়ুন কবির

পলায়ন : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (ডি, এম, লাইব্রেরী—মূল্য ২৲)।

বর্ত্তমানের নিপীড়িত সামাজিক সত্তার সুস্থ ভবিষ্যৎ কল্পনা করা যে সৎ সাহিত্যিকের লক্ষণ এ-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করবার অবকাশ নেই। কিন্তু সমস্ত সাহিত্যিকের মেজাজ এবং মর্জ্জি একই ছাঁচে তৈরী হতে পারে না—মানুষের মনঃপ্রবাহ একই ধারায় প্রবাহিত করবার মত একনায়কতা বাংলা দেশে অনুপস্থিত। কাজেই অন্য উপায়েও এ-দেশে সৎ সাহিত্যিক হওয়া চলে। শরৎচন্দ্রের পর আমরা সমাজের স্থিতাবস্থার বর্ণনাকারকেই সৎ সাহিত্যিক বলতে অভ্যস্ত

হয়ে এসেছি। সামাজিক অভিজ্ঞতা যাঁর লেখায় যত ব্যাপক তিনি তত বেশি বাহবা অর্জ্জন করতে পেরেছেন।

এ কথা অসংশয়ে বলা যায় যে শরৎচন্দ্রের পরবর্ত্তী লেখক-সম্প্রদায়ের মধ্যে অচিন্ত্যকুমারের রচনাতেই ব্যাপক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রমাণ তাঁর গল্প-সাহিত্যই বহন করছে। অচিন্ত্যকুমারের গল্পে অগণিত চরিত্রের ভীড়, স্বভাবের স্বাতন্ত্র্য এবং পরিপার্শ্বের বিভিন্নতায় তারা প্রত্যেকে পৃথক। তাই কোনো গল্পই তাঁর ক্লাসিকর নয়, সবসময়েই পাঠক একটু-না-একটু নূতন স্বাদ, নূতন আবহাওয়া আবিষ্কার করবার আনন্দ পান। 'পলায়ন' বইটিতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সুদক্ষ অভিনেতাকে নূতন চরিত্রে দেখার যে আনন্দ 'পলায়নে'র অধিকাংশ গল্পে অচিন্ত্যকুমার পাঠককে সেই আনন্দই দিতে পেরেছেন। সেই 'অধিকাংশ গল্প' মফঃস্বলের এমনি একটা পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে তুলেছে যা বাংলা সাহিত্যে কোনো দিন ছিল না। মফঃস্বলের জীবন বাংলা দেশের জীবনের অনেকখানি জুড়ে আছে, তার সঙ্গে আমাদের অনেকেরই হয়ত নাড়ীর সংযোগ ঘনিষ্ঠ—এস্-ডি-ও, ডেপুটি, মুন্সেফ, উকীল, মোক্তার, মক্কেল, সাক্ষী, সবরেজিষ্ট্রার, মাষ্টার যা দিয়ে বাংলা দেশের প্রায় গোটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীটাই তৈরী তাদের পারিবারিক জীবনের গণ্ডীবদ্ধ আশা-আকাঙ্ক্ষা সার্থক বর্ণনায় ও প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে অচিন্ত্যকুমার সাহিত্যের পর্য্যায়ে এনে উপস্থিত করেছেন। গল্পগুলো অসাধারণ না হলেও অভূতপূর্ব্ব।

বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিয়ে যাঁরাই সাহিত্য সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন, সজ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক এ সত্যটি তাঁরা উপলব্ধি না করে পারেননি যে হিন্দু মধ্যবিত্তের সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে আজ ভাঙন ধরেছে। জীবন সম্বন্ধে সুস্থ আদর্শ এদের নেই, অস্বাভাবিক, সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তিতে এরা আচ্ছন্ন, সভ্যতার বিকৃত মুখোসে কুৎসিত। অচিন্ত্যকুমার বরাবরই আমাদের বিকৃত জীবনকে আঘাত করে এসেছেন, 'পলায়নে'র গল্পগুলোতেও সংযতভাবে তাঁর এই আক্রমণ চলেছে। বাঙালীর দুর্ব্বল স্বভাব তাঁর শাণিত বিদ্রূপের হাত থেকে অব্যাহতি পায়নি, বুদ্ধিশীল পাঠক এখানেই সবচেয়ে বেশি খুসী হয়ে ওঠেন।

কিন্তু বুদ্ধিশীল পাঠকের সংখ্যা এ-দেশে নিতান্তই কম। তাই অচিন্ত্যকুমারের একটা পাঠকের দল আছে সত্যি কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তা সুবিস্তৃত নয়। তাঁর ভাষাও তার জন্যে অনেকটা দায়ী। ভাষাকে তিনি সাধারণের বোধগম্যতার পঙ্কু, প্রাঞ্জলতায় নামিয়ে আনেন নি—এ যেন অতি সাবধানী ভাষা, বহু যত্নে তার অবয়ব গঠিত, শিল্পীমনের স্পর্শ লেগে আছে যার প্রত্যেকটি বাঁকে—বিদগ্ধজনকে তা আশাতিরিক্ত তুষ্টি দান করে নিঃসন্দেহ কিন্তু গল্পের সরল গতিকে খানিকটা ম্লান না করে নয়। অচিন্ত্যকুমারের গল্প তাই ততটা গল্পের পাঠকদের জন্যে নয় যতটা সাহিত্য-পিপাসুদের জন্যে। এ আভিজাত্যের দরুণ নিন্দা-প্রশংসা উভয়ই তাঁর প্রাপ্য।

তবে 'পলায়ন' সম্বন্ধে এই অসঙ্কোচ প্রশংসোক্তি করা যায় যে তা অচিন্ত্যকুমারের গল্পসাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি মাত্র করেনি, তার ভাণ্ডারকে যথার্থই সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

MOMENT IN PEKING by Lin Yutang (Heinemann. 15s.)

বিশ্বসভ্যতায় চীনের পরিচায়কদের মধ্যে লীন ইয়ুটাং অন্যতম—কেউ কেউ হয়তো বলবেন শ্রেষ্ঠতম। এ কথা অবিসম্বাদী যে My Country And My People (আমার দেশ ও আমার দেশবাসী) গ্রন্থে লীন ইয়ুটাং চীনের অন্তরকে যে ভাবে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন, সাহিত্যে তার খুব বেশী তুলনা নেই। পাণ্ডিত্য এবং দরদ একত্রে মেলা কঠিন। এ দুয়ের সমন্বয় যদিও বা মেলে, তার সঙ্গে কৌতুক বোধের সমাবেশ আরো বিরল। লীন ইয়ুটাং একাধারে পণ্ডিত, দরদী এবং রসিক। তাই "আমার দেশ ও দেশবাসী" যিনি পড়েছেন, তিনিই বুঝেছেন যে লীন ইয়ুটাং গল্প রচনার জন্য যে যে গুণের প্রয়োজন, তার সবগুলিরই অধিকারী।

Moment In Peking আমাদের সে প্রত্যাশাকে বঞ্চিত করে না। এ পর্য্যন্ত চীন দেশের বিষয়ে যে সব গল্প লেখা হয়েছে, তার অধিকাংশের লেখক বিদেশী। পার্ল বার্কের মতন দরদী লেখিকার পক্ষেও সম্পূর্ণভাবে চৈনিক অন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। বিদেশীর অহংকার বা গর্ব্ব থেকে তিনি মুক্ত, কিন্তু স্বদেশীর অন্তর্দৃষ্টি তিনি পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারেননি। তাই তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলি উপভোগ্য, চীনের জীবন সম্বন্ধে অনেক তথ্যও তাতে মেলে, কিন্তু চীনের আত্মা তার মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠেনি।

লীন ইয়ুটাংয়ের প্রধান কৃতিত্ব এইখানে। Moment In Peking-এ তাই আমরা চীনের অন্তরাত্মার সাক্ষাৎ পরিচয় পাই। গল্প হিসেবে বইখানির হয়তো খুঁত বের করা চলে, তবে লীন ইয়ুটাং গল্পের দিকে দৃষ্টিও বেশী দেননি। মোটামুটীভাবে তার গল্পাংশ একটী সমৃদ্ধ চীনা পরিবারের চল্লিশ বৎসরের ইতিহাস। বক্সার বিদ্রোহের সময় চীনের বহুযুগ প্রাচীন সংস্কারে প্রথম আঘাত লাগল—তখনো কিন্তু ফাটল স্পষ্ট হয়ে উঠেনি। কিন্তু সেই আন্দোলনের মধ্যে যে সমস্ত তরুণ যুবকযুবতী প্রাচীন জীবনপন্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ল, তাদের আর পুরোণো রীতিতে পুরোপুরি ফিরে যাওয়ার উপায় রইল না। একদিক থেকে দেখলে মুলানকে বইখানির নায়িকা বলা চলে—নায়ক কেউ নেই। বক্সার বিদ্রোহের সময় মুলান আত্মীয় সঙ্গচ্যুত হয়ে পড়ে। দাসব্যবসায়ীদের হাতে পড়েও মুলান বেঁচে গেল, কিন্তু সেই সূত্রে নতুন যে পরিবারের সঙ্গে তার যোগ স্থাপিত হ'ল, মুলানের পরবর্ত্তী জীবনের গতি তাতে বদলে গেল। স্বভাবকুলীন মুলান পুরাতনকে বর্জ্জন করল না—আবার নতুনকে পূরোপূরি গ্রহণও করল না। ব্যক্তিত্ব-বোধের সুর তার মধ্যে স্পষ্ট, পরিবার বা গোষ্ঠি চেতনা ছাড়িয়ে সে সত্ত্বা হিসেবে ফুটে উঠতে চাইছে, অথচ পুরোপুরি ফুটবার সময় তখনো আসেনি। মুলান তাই আধুনিক হয়ে উঠতে পারল না।

শেষ পর্য্যন্ত মুলান প্রাচীনপন্থার দিকেই হয়তো ঝুঁকে পড়ত। ১৯২৬ সালে চীনের নতুন জাতীয় জাগরণ তাকে পুরোপুরি জাগাতে পারেনি, বরং সে সংঘাতে সে প্রাচীনের দিকেই সরবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ১৯৩২-র পরে থেকে চীন জীবনধারা জাপানী আক্রমণে যে তুমুল ভাবে আন্দোলিত হয়ে উঠ্‌ল তাতে আবার মুলানের জীবনের গতি ফিরে গেল। নিজের মেয়ে

যেদিন জাতির জাগরণের জন্য প্রাণ দিয়ে ছিল, সেদিনও মুলান শান্তি এবং স্বস্তি খুঁজেছে। অন্য মেয়ে যেদিন আবার জাপানী আক্রমণের মুখে অতর্কিতে বেঁচে গেল, সেদিন মুলান বুঝল যে বিপদকে এড়ালে চলে না, বিপদকে মুখোমুখী করেই বিপদ জয় করা যায়।

মুলানের চরিত্র অপূর্ব্বভাবে ফুটে উঠেছে। তাকে আরো আমরা ভালবাসতে পারি। কেবল শ্রদ্ধা বা ভয় করবার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বর্ত্তমানের চীনে বিভিন্ন ধারার যে সমন্বয়, তার সবচেয়ে বেশা পরিচয় মেলে মুলানের পিতা মিষ্টার ইয়াও-র চরিত্রে। একদিকে সন্দেহবাদী এবং মুক্তবুদ্ধি, অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বিশ্বাস তাঁর রক্তের মধ্যে জড়িত—ভারতবর্ষে কি এ রকম চরিত্র আমরা প্রায় প্রতিদিনই দেখি না ?

নানা দিক থেকে বিবেচনা করে লীন ইয়ুটাংয়ের এ বইখানিকে চীনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় বল্লেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। চীনের জাতীয় জীবনের বহুদিক তাতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। চরিত্রগুলি সমস্তই ভদ্রশ্রেণীর, এবং লীন ইয়ুটাংয়ের নিজের সহানুভূতিও এ শ্রেণীর জন্য স্পষ্ট, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর লেখায় কোথাও শ্রেণী-চেতন কটু বা বিসদৃশ হয়ে উঠেনি। বাংলা দেশ নিয়ে এ রকম বই লিখলে তাতে বাঙালী এবং অবাঙালীর দুয়েরই লাভ। কোন বাঙালী লেখক কি সে চেষ্টা করবেন না ?

আবদুল আলি

পরিহাস-বিজল্পিতম্—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। কাত্যায়নী বুক্‌ ষ্টল, দাম এক টাকা।

প্রমথবাবুর একাঙ্ক নাটকখানি আদ্যন্ত পড়ে আমার এই ধারণা হয়েছে যে তাঁর মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর নাট্যপ্রতিভা রয়েছে কিন্তু তা' এখনও স্বকৃত গণ্ডী অতিক্রম করেনি। তাঁর নাটকে অভিনবত্ব আছে যেটা অনেক স্থলে চমকপ্রদ। শ্লেষের ছলে তিনি এমন শাণানো কথা মোলায়েম করে বলেন যেটা মৃদু হলেও কশাঘাত বটে, আর কখনো বা গুরু ও চিন্তনীয় তথ্যকে ব্যঙ্গ-কৌতুকে মিলিয়ে দেন যেটা বুদ্ধিমান্ পাঠক বৈদগ্ধ্যের অঙ্গ বলেই স্বীকার করে নেয়। রাষ্ট্রিক অথবা সামাজিক জীবনে আমাদের যে কপটতা বা গলদ আছে, প্রমথবাবু প্রায় তাঁর সমস্ত রসরচনাতেই সেগুলো উদ্‌ঘাটিত করেছেন কখনো নির্ম্মমভাবে, কখনো স্মিতহাস্যের মধ্যস্থতায়। 'ঋণং কৃত্বা', 'ঘৃতং পিবেৎ', 'মৌচাকে ঢিল', অথবা আলোচ্য এই নাটকে—সর্ব্বত্রই প্রমথবাবুর জোরালো মন্তব্য আছে যা' রীতিমত বেঁধে এবং চরিত্র-চিত্রণে, পারিপার্শ্বিকে আর সর্ব্বোপরি তাঁর একান্ত-নিজস্ব কথোপকথনের অনবদ্য ভঙ্গিমায় অপ্রিয় অথচ চিত্তহারী সত্য হিসাবে ফুটে ওঠে। এ ছাড়া মোটামুটি প্রথম দুখানি নাটকের পদ্ধতি শেষোক্ত নাটক দুখানির আঙ্গিক থেকে পৃথক্ হলেও তাঁর প্রসঙ্গ অথবা বক্তব্য বিশেষ কিছু বদ্‌লায়নি। এটা তাঁর মনোভাব এবং আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার পরিচয় হলেও তাঁর চিন্তাশক্তির অগ্রসরতায় সাহায্য করেনি এবং করছে না।

মৌচাকে ঢিল' এবং 'পরিহাস-বিজল্পিতম্' নাটক দুখানি গড়নের দিক্ থেকে বাঙলা সাহিত্যে নূতন ও দুঃসাহসিক পরীক্ষা নিশ্চয়ই। এর দৃশ্য-সংস্থান ও নাটকীয় কৌশল রঙ্গমঞ্চে যদি সাফল্য লাভ না করে, তা হলে সেটা বাঙালীর রসবোধ ও গ্রহণশক্তির শোচনীয় অভাব ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। পদ্ধতিটা কিছু পরিমাণে বিদেশীয় নাটকের শিল্পমার্গ অনুসরণ করেছে, কিন্তু তাতে প্রমথবাবুর স্বকীয় শিল্পচাতুর্য্য ভালো ভাবেই বজায় আছে—যদিও আমার সন্দেহ হয় যে যে-ভাবে তাঁর উর্ব্বর মস্তিষ্কে নূতন ও উদ্ভট পরিকল্পনা খেলে যায়, কি কথায় ও পরিবেশে, তাতে তাঁর সাহিত্য-প্রীতির চেয়ে সমাজ-সচেতনতা কম নয়, বরঞ্চ মজলিশী তর্কপ্রিয়তাই তাঁকে বার্ণার্ড শ'এর পথে নাট্যরচনায় নিয়ন্ত্রিত করেছে। কিন্তু প্রমথবাবুর মননশীলতার পক্ষে সেটা খুব উন্নতির সূচনা করছে না, যদিও এ কথা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করি যে তাঁর ডায়ালোগ্ সত্যিই উঁচু দরের এবং তাঁর নাটকে কথ্য ও তথ্য, উভয় বস্তুই বিশেষভাবে রসজ্ঞের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'পরিহাস-বিজল্পিতম্' শুধুই পরিহাসের প্রলাপ নয়, অথবা এক ঘটনার নির্দ্দোষ সময়ক্ষেপের সুযোগ-সাপেক্ষ উপলক্ষ্যও নয়। তা' যদি হ'ত, তাহলে প্রমথবাবুর নাট্যরচনা সম্পর্কে এতটা বিস্তারিত আর কিছু পরিমাণে প্রতিকূল সমালোচনার অবকাশ থাক্‌ত না। সেই সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আর প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিচয় ও সন্ধান মেলে। প্রমথবাবুর দৃষ্টিভঙ্গী পরশুরামের মতো নয়, যেহেতু দু জনের রচনা ভিন্নগোত্রীয় সাহিত্য। পরশুরামের শিল্প স্বাশ্রয়ী, সম্পূর্ণই ইঙ্গিত ও রেখার সাহায্যে অভিব্যক্ত, স্বয়ংসিদ্ধ অতএব দুরূহ। প্রমথবাবুর দৃষ্টি তির্য্যক্, আপাত-জটিল হলেও মোটের উপর সহজ। বক্তব্য আর বিদ্রূপভঙ্গীর ওপর তার তীক্ষ্ণতা অনেকটা নির্ভর করে।

প্রমথবাবুর নাটক সম্পর্কে আর একটি কথা এই যে বলিষ্ঠ বক্তব্য সত্ত্বেও তাতে পলায়নী মনোবৃত্তির আভাস আছে। সত্যকে তিনি মুখোমুখি গ্রহণ করেন না,—হয় তাকে পুনরাবৃত্তির টানে অতিভাষণ করেন নয় ব্যঙ্গ ক'রে অতিরঞ্জন করেন, অর্থাৎ সত্যকল্পতার আবরণে আত্মগোপন করেন—যথা তাঁর বাঙালিয়ানা। বাঙালী-প্রীতি এবং বাঙালীর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থার আলোচনা বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ দান এবং তা' অবজ্ঞার বস্তু ত নয়ই, বরং শ্রদ্ধার বিষয়। কিন্তু ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়েও বাঙালীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অন্য দৃষ্টির সাহায্যেও দেখা চলে।

আমার শেষ মন্তব্য হ'ল এই—প্রমথবাবু আপনার অজ্ঞাতসারে আপনার বিশিষ্ট ক্ষমতাকে একটা মানসিক মুদ্রাদোষে অথবা পোজ্-এর পর্য্যায়ে এনে ফেল্‌ছেন। সকল লেখকেরই অবশ্য আছে—কি স্বদেশে কি বিদেশে যেমন বার্ণার্ড শ', চেস্‌টারটন, অথবা বীরবলের রচনায়। কিন্তু 'পরিহাস-বিজল্পিতম্'-এর পরিশিষ্ট 'মৌচাকে ঢিল'-এর মুখবন্ধেরই পুনরাবৃত্তি।

প্রমথবাবুর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অ-সাধারণ বল্‌লেই হয়। তাঁর লিপিকৌশল উপভোগ্য ও ঈর্ষ্যার বস্তু। কিন্তু তিনি যে-ভাবে চাতুর্য্যদীপ্তিতে আমাদের অভিভূত ক'রে এড়িয়ে যান্, তাতে মন পরিতৃপ্ত হয় না, অনায়াস-ক্ষিপ্রতায় উত্তেজিত হয় মাত্র।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বেদেনী—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতী-ভবন, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

ভাবের আতিশয্যে নয় অথবা স্বার্থপ্রণোদিত কপটস্তুতিকার হিসাবেও নয়, নিতান্ত পক্ষপাতশূন্য সমালোচক হিসাবেই তারাশঙ্করবাবুর 'বেদেনী' নামক গ্রন্থখানি পাঠ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, লেখক নিঃসন্দেহ ক্ষমতাশালী। আত্মশক্তিতে সমাহিত তাঁর স্বাজাতিক মন, তেজোদৃপ্ত জাগ্রত শিল্পিদৃষ্টি, রুচিস্মিত ক্ষিপ্রগতি প্রাঞ্জল সাধুভাষা সর্ব্বক্ষেত্রে না হলেও ক্ষেত্রবিশেষে একান্ত অনিন্দনীয় ও অনুচিকীর্ষার বস্তু।

সর্ব্বপ্রথমেই সমধিক সূক্ষ্মালোচনায় না গিয়ে, স্থূলভাবে লেখকের রচনাক্রম বিশ্লেষণ করলে ন্যূনাধিক পরিমাণে যা পরিস্ফুট হয়, তা হচ্ছে, তাঁর মধ্যে ত্রি-চান্দ্রিক প্রভাব। অবশ্য এ-প্রভাব যে সৌর-জাগতিক চন্দ্র সম্বন্ধে এ-স্থলে ব্যবহৃত হয়নি তা উক্ত 'চন্দ্র' শব্দের পূর্ব্বে 'ত্রি' শব্দ যোজনাদ্বারাই পাঠক উপলব্ধি করবেন। এই ত্রি-চন্দ্র হচ্ছে বাঙলার বাঙ্ময় সাহিত্য-জগতের বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের কথা। এঁদের প্রথম ও শেষোক্ত ব্যক্তি ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক হিসাবে এবং মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তি নাট্যকার হিসাবে মদ্দেশীয় জাতীয়-সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছেন। তারাশঙ্করবাবুর সাহিত্য-সাধনার মধ্যেও অল্পবিস্তর ভাবে উক্ত মনীষীদের আদর্শানুগত গ্রাম্য বিষয়বস্তুর প্রভাব, নাটকীয়ত্ব, অবিকৃত চরিত্র-চিত্রণ ও ঘটনা-সংস্থানের বাস্তবিকতা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত ত্রিধারায় বহমান। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রসায়নশাস্ত্রের সামান্য মিশ্রণের মত (mechanical mixture) এও যেন সোরা, গন্ধক ও কয়লার সহযোগে বারুদের প্রস্তুতি। উল্লিখিত প্রভাব ব্যতীত, সাহিত্যের আরও অন্যান্য বহুমুখো রসের প্রকাশে ও বহুবিধ বিচিত্র বিষয়বস্তুর উৎকর্ষে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিরল বল্লেও ব্যতিক্রম হয় না। এ-ছাড়া তাঁর রচনার আর একটি প্রধান ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা একান্তই প্রাচীন ঘেঁষা ও পল্লীমুখী।

কিন্তু সাহিত্য কালধর্ম্মী। প্রত্যেক যুগেই মানুষের ব্যক্তিগত ধর্ম্ম, সামাজিক ধর্ম্ম বা শ্রেণীগত ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে পরিগ্রহ করে বিভিন্ন রূপ। বিভিন্ন সময়ের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ও মনোবৃত্তিক অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সে সৃষ্টি করে বিভিন্ন পরিবেষ্টনী—পরিবর্ত্তন করে বিষয়বস্তুর এবং পরিকীর্ত্তন করে বিভিন্ন আদর্শের। বর্ত্তমানে আবেগের স্থান, আদর্শের স্থান আপেক্ষিক দৃষ্টিতে অনেকখানি শ্লথ হয়ে এসেছে। বুদ্ধিজীবী মানুষকে আজ কঠিনভাবে জুজতে হচ্ছে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে এবং মনোবেগের দিক থেকে মানুষের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকলেও, বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে তারা হয়ে পড়ছে পরস্পর-বিরোধী। ফলে, সাহিত্যে আজ আদর্শের স্থান সংকীর্ণ ও আবেগের গন্ধ উবে গিয়ে—তৈরি হচ্ছে এক নতুন ধরণের সাহিত্য এবং তার গতি হচ্ছে বস্তুতান্ত্রিক প্রাধান্যের দিকে। এ-সব দোষের কি অদোষের, এর দ্বারা আমাদের জাতীয়-জীবনের খর্ব্বতা ঘটছে-কি-ঘটছে না, এ-ক্ষেত্রে সে সম্বন্ধে বিশেষ বিশ্লেষণে না গিয়েও বস্তুতঃ এটা দেখেছি যে, প্রাচীন সমস্যা ও পূর্ব্বতন আদর্শের সঙ্গে আজকের দৈনন্দিন জীবন প্রতিপদেই হোঁচট্ খাচ্ছে এবং আজকে আমাদের যা সম্মুখীন হতে

হচ্ছে তা বহু ক্ষেত্রেই প্রাচীনাদর্শের বিরোধী। মানুষের মানসিক ও ব্যবহারিক জগতে এই সব নতুনতর সংঘাতের ফলে আজকের যে নতুনতর সাহিত্য গড়ে উঠেছে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বর্তমান মানুষেরই জীবন-কেন্দ্রিক এবং তার পটভূমিতে যা সব প্রতিভাত হচ্ছে তা ব্যষ্টি বা সমষ্টিগত বর্তমান জীবনেরই কোন-না-কোন সমীক্ষিত বিষয়। একে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই, সাহিত্যে কালধর্ম্মের এ প্রভাব আসবেই আসবে—বিষয়বস্তুর মধ্যে এর আঁচ না লাগাই অস্বাভাবিক। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থের লেখক তারাশঙ্করবাবুর গায়ে সে আঁচ লাগে নি। তিনি আজও প্রাচীন পল্লীবাসীর কৌলীন্য বজায় রেখে, তার বিচিত্র বৈভবের মধ্যেই বিচরণ কচ্ছেন—তার স্নিগ্ধ শ্যামলীমার দিকেই চেয়ে আছেন নির্নিমেষ। নগরধর্ম্মী সাহিত্যের বিকৃতি, নাগরিক সভ্যতার কৃত্রিমরূপ ও তার মানুষের বিলাপ-বিলসন তাঁর সাহিত্যাদর্শের মধ্যে স্থান পায়নি। গ্রাম্য কলহ দলাদলি, দুঃখ দারিদ্র্য, মহামারী অনশন পল্লীবুকে তার খরনখর বসিয়ে তাকে অস্থিচর্ম্মসার করে তুললেও, এখনও তার মধ্যে বৈচিত্র্যের যে অভাব ঘটে নি, এখনও তার মধ্যেই যে আছে জীবন ও জীবনযাত্রার বহুরূপ, বিবিধ সমস্যা; সেখানেও যে আছে বিভিন্ন স্তরের নরনারীর মধ্যে ঈর্ষা দ্বেষ, প্রেম প্রীতি, শ্রদ্ধা ঘৃণা, জীঘাংসা রিরংসা প্রভৃতি বৃত্তির সমাবেশ,—সেখানেও যে আছে ভয়াল অত্যাচারী জমিদার, নির্ব্বিরোধ অসহায় প্রজা রক্তপিপাসু ডাকিনী শাকিনী, উগ্রচণ্ডী বেদেনী যোগিনী; নিম্নস্তরের ডোম বাগ্দী, কোল ভিল সাঁওতাল, সমাজদ্রোহী দস্যু তস্কর খুনে, আন্তিক্যাভিমানী ন্যায়তীর্থ তর্কবাগীশ প্রভৃতি বহুবিধ জীবন ও বস্তুবৈচিত্র্য,—সেই সকল বিষয়ই বিস্তারভাবে ও দৃষ্টিভঙ্গির বিশিষ্টতায় তারাশঙ্কর-বাবুর চনার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছে। তথাকথিত ইঙ্গবঙ্গ সভ্যতার sham shallow প্রেম-বিরহ-কথায় যাঁরা বীতস্পৃহ, তাঁরা তারাশঙ্করবাবুর এই রচনা পড়ে খুশি হলেও.—সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বজনীন সাহিত্যাদর্শের দিক থেকে ভাবীকালের রসিকসমাজ তাঁর এই একপেশেমিকে ঠিক কি ভাবে গ্রহণ করবেন বলা শক্ত।

তাঁর বর্ত্তমান 'বেদেনী' নামক গল্প-সংগ্রহটির অধিকাংশ গল্পই বিচিত্র আনুসঙ্গিকের দ্বারা গ্রাম্য আবহাওয়ার পারিপার্শ্বিকেই বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং যে দু'একটির ঘটনাস্থান পথভুলে শাহরিক আবেষ্টনের মধ্যে গিয়ে পড়েছে, সেগুলিও মুখ্যত হয়েছে গ্রাম্যমুখী।

প্রথম গল্পের নামানুসারেই হয়েছে গ্রন্থখানির নামকরণ এবং বলতে দ্বিধা নেই যে, অসন্দিগ্ধভাবেই এ গল্পটি হয়েছে উপভোগ্য। শারীরিক, মানসিক ও ব্যবহারিক অবস্থানে পরস্পরবিরোধী অথচ সমব্যবসায়ী দুই বাজিকর শম্ভু ও কেষ্টোর মধ্যে কাঙ্কালীর মেলায় একরকম আভিজাত্য নিয়েই ঝগড়া বাঁধে, এবং শেষ পর্য্যন্ত বয়োবৃদ্ধ শম্ভুর অল্পবয়স্কা বৌ বেদেনী রাধিকা—যৌবনমদগর্ব্বে গর্ব্বিতা সবল, দৃঢ়, শ্যামকান্তি, দীর্ঘবয়ব বেদিয়া কেষ্টোকে ভালোবেসে, এক গভীর রাত্রে বুড়ো শম্ভুর তাঁবুতে আগুন জ্বালিয়ে উধাও হয়। সংক্ষেপে গল্পটির সারাংশ অতি তুচ্ছ মনে হলেও, বহু উত্তেজক ঘটনা ও এই জাতীয় মনের মানসিক দ্বন্দ্ব গল্পের মধ্যে একটি বিশেষ চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া উক্ত গল্পের ঘটনা বিন্যাসের মধ্যেও যেমন আছে অভিনবত্ব তেমনি চরিত্র-চিত্রণের মধ্যেও আছে অবিকলতা। এমন

আনুপূর্ব্বিক জমাট গল্প কেবল শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের মত চোখের সামনে চিত্রই প্রতিফলিত করে না, বহুদিন ধরে একটা ছাপও রেখে যায়।

দ্বিতীয় গল্প 'পিতা পুত্র'-র মধ্যে আদর্শের সংঘাত অতি সুষ্ঠুভাবে প্রকটিত হলেও এবং প্রাচীন আদর্শের আগুনে যথাযথ পুত্রের আত্মাহুতি ঘটলেও, মধ্যপথে গল্পের tension যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত হয়েছে এবং আলাপ-আলোচনার মধ্যেও বহু হেত্বাভাষ (fallacy) ও অসংগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে ন্যায়তীর্থের যোগ্য পুত্র পণ্ডিত শশিশেখরের আলোচনার মধ্যে একস্থানে তিনি উক্ত দর্শনে আত্মার অস্তিত্বের পরিচয় অগোচর বলেই যুক্তি দেখিয়েছেন, এবং আত্মোপলব্ধি যে আমাদেরই একচেটিয়া সেই ইঙ্গিতেরই আভাস দিয়েছেন। অবশ্য একথা ঠিক যে, আত্মার অস্তিত্বই যদি না থাকে তাহ'লে আর তার উপলব্ধির প্রশ্ন আসে কোথা থেকে! কিন্তু যতদূর মনে হয় পূর্ব্বাধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের বহু গ্রন্থেই ইতঃপূর্ব্বে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে এবং উক্ত দেশীয় ধর্ম্মগ্রন্থের অতিকথিত বাক্য to know thyself অর্থে যে আত্মোপলব্ধিরই কাছাকাছি একটা কিছুকে বোঝায় তা শশিশেখর না বুঝলেও তারাশঙ্করবাবু নিশ্চয়ই বুঝবেন। এই গল্পেরই অপর এক স্থানে ন্যায়তীর্থ, মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিত-মণ্ডলীর এক অধিবেশনের বিচারসভায়, শশিশেখর ন্যায়তীর্থ ও তস্য পিতৃদেব পণ্ডিত শিবশেখর ন্যায়তীর্থের মধ্যে অদ্বৈত-পরমব্রহ্ম সম্বন্ধে বিচারটিও ঠিক যুক্তিসঙ্গত হয়েছে বলে মনে করি না। ইংরেজি তর্কশাস্ত্রীয় (logic) বিচারপদ্ধতিতে সাধারণত আমরা দুটি premises ও একটি conclusion পাই syllogism বলে; কিন্তু এস্থলে দেশীয় পণ্ডিতদের বিচারসভায় শিবশেখর ন্যায়তীর্থের পণ্ডিত পুত্র শশিশেখর ন্যায়তীর্থের পক্ষে হিন্দুদর্শনানুযায়ী ত্রিপাদের পরিবর্ত্তে পঞ্চমপাদ পর্য্যন্ত বিচার করাই যুক্তিসঙ্গত ছিল না কি? তাছাড়া অন্যত্র 'সুস্পষ্ট' ও 'বিস্পষ্ট' শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে পিতাপুত্রের বিতর্কের মধ্যে যে দীর্ঘস্থান ও কালক্ষেপণ করা হয়েছে তাও অতি-মাত্রায় অসঙ্গত। পিতাপুত্র এঁরা যখন উভয়েই পণ্ডিত এবং সুস্পষ্ট ও বিস্পষ্ট শব্দের যখন অর্থগত নির্দ্দিষ্ট প্রয়োগবিধি আছে, তখন কেবলমাত্র এই দুটি শব্দের উপর ভর করে এই অনর্থ সৃষ্টিকে tempest in a tea-pot আখ্যায় আখ্যাত করলেও দোষের হয় না। এ ছাড়া উপমার ক্ষেত্রে উক্ত গল্পের একস্থানে এক সাহেব পণ্ডিতের প্রসঙ্গ কথায় 'থাজা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে গৌরবার্থে। অবশ্য এটি যদি 'থাঁটি' বা 'থাস' শব্দের পরিবর্ত্তে মুদ্রাকর প্রমাদ ঘটে থাকে তাহলে বলবার কিছু নেই।

গ্রন্থখানির মধ্যে স্থানে স্থানে এই ধরণের উপমাগত ত্রুটি, শব্দবিজ্ঞাস বিপর্য্যয় ও পতৎপ্রকর্ষতা দোষ প্রভৃতি অলঙ্কার শাস্ত্রীয় বৈলক্ষণ্যও ঘটেছে যথেষ্ট। তারাশঙ্করবাবুর প্রসিদ্ধি সর্ব্বজনবিদিত বলেই তাঁর গ্রন্থে এই সকল ত্রুটি সামান্য হলেও স্থান পাওয়া অনুচিত বলে মনে করি। উপমাগত ত্রুটি সম্বন্ধে এখানে মাত্র কয়েকটি স্থানের উল্লেখ করছি যথা: 'চোর' গল্পের মধ্যে আমরা পাই 'শাণিত সূচের ন্যায়' 'শাণিত' শব্দ সাধারণত আমরা অস্ত্র সম্পর্কে ব্যবহার করে থাকি; যেমন: শাণিত তরবারি, শাণিত খড়্গ প্রভৃতি। সূচের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ বিশেষণই বোধ হয় যথেষ্ট ছিল। 'দিল্লীকা লাড্ডু' গল্পের

মধ্যে দু'একটি উপমা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক বলে মনে হয়। গল্পে উল্লিখিত ব্যক্তি শ্যাম সম্পর্কে বলা হচ্ছে: 'একেই স্ত্রীকে সে বাঘিনীর মত ভয় করে; তাহার উপর অকস্মাৎ তাহাকে উল্কামুখী হইতে দেখিয়া বুকটা তাহার টিপ-টিপ করিয়া উঠিল।' সাধারণত মাথা বা কপালের ক্ষেত্রেই আমরা 'টিপ টিপ' শব্দ ব্যবহার করে থাকি এবং বুকের ক্ষেত্রে করি 'ঢিপ ঢিপ'। তাছাড়া উল্কামুখী সম্পর্কেও কিছু বক্তব্য আছে। উল্কামুখী খেঁকশেয়ালীর নামান্তর। অতএব যে স্ত্রীকে সে বাঘিনীর মত ভয় করে, হঠাৎ তাকে আবার খেঁকশেয়ালীর মত হতে দেখা এবং সেই দেখে বুক 'টিপ টিপ' করার বাক্যবিন্যাসের মধ্যে সূক্ষ্মরুচির পরিচয়াভাব দৃষ্ট হয়। উক্ত গল্পেরই আর এক স্থানে আমরা পাই: 'সুগ্রীব মহিষীর মত মুখভঙ্গি করিয়া সে বলিল।' সুগ্রীব মহিষী রুমার মুখভঙ্গি সম্বন্ধে প্রাচীন কোন গ্রন্থে উল্লেখ পেয়েছি বলে মনে হয় না; যদিও থাকে, এটি এমন একটি বহু প্রচলিত বাক্য নয় যার দ্বারা অপামরসাধারণের মনে সহজেই সেই চিত্রটি সুস্পষ্ট ক'রে তোলা যেতে পারে। তাছাড়া কদর্থ হিসাবেও যদি এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাহলে সুগ্রীব মহিষীর নামোল্লেখ না করে এ-স্থলে যে-কোন কপিস্ত্রীর উল্লেখ করলেও ক্ষতির কোন কারণ ছিল না। 'বাণী মা' গল্পে 'হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল' খুব তৃপ্তিকর উপমা নয়। 'ডাইনী' গল্পের মধ্যে 'শুকাইয়া ফ্যাঙাসে হইয়া......' সম্পর্কে জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, কথাটা ফ্যাঙাসে না ফ্যাকাসে? এ-সব ছাড়াও 'অন্তস্তলের' ক্ষেত্রে 'অন্তঃস্থল' প্রয়োগ; 'সলজ্জিতার' মধ্যে ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় তাচ্ছিল্যের প্রকাশ এবং 'নাকছাবি'র পরিবর্তে 'নাকচাবী' দৃষ্টিকটু।

মোটের উপর অনুবধানজনিত এই সব সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা বাদ দিলে বর্তমান গ্রন্থের 'রাধারাণী', 'ইতিহাস', 'পিতাপুত্র', 'ডাইনী' প্রভৃতি কয়েকটি গল্পের লিপিচাতুর্য্য ও অপূর্ব্ব ঘটনাবিন্যাসের সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির সানুরাগ পর্য্যবেক্ষণশক্তি লেখকের প্রতি প্রযুক্ত আমার পূর্ব্বকথিত যশাভাসেরই সামঞ্জস্য রক্ষা করবে।

বিশু মুখোপাধ্যায়

THE BLAZE OF NOON, by Rayner Heppenstall (Martin Secker & Warburg. 6*s*.)

যুদ্ধ-পর যুগ ইংল্যাণ্ডের মধ্যবিত্ত নীতিবাদের দুর্গে ভাঙ্গন ধরিয়ে দিলো, তারপর বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠলো লরেন্সের উপন্যাসে। কন্টিনেন্টে উপর্য্যোপরি বিপ্লবের দরুণ বিদ্রোহের এ-শিখা অনেক পূর্ব্বেই বিস্তৃতি লাভ করেছিলো; কিন্তু ইংল্যাণ্ড তখনো গুটিপোকার মত মধ্যবিত্ত রক্ষণশীলতার খোলসের ভেতরেই পরিক্রমণ-কাতর। যৌন-সত্যকে সে স্বীকার করে নিয়েছিলো সন্দেহ নেই, কিন্তু ভিক্টোরীয় অনুসাশনের আওতায় তাকে অস্পৃশ্য করে

একদিন ধূলিসাৎ হয়ে গেল, এবং তখন থেকেই প্রাচীন নীতিবাদের বিরুদ্ধে অভিযানের আরম্ভ; এই বিদ্রোহের মধ্যে লরেন্সের উদ্ভব। ভালোবাসার শিকড় যে যৌন-মিলনে এ-কথা তিনিই প্রথমে প্রচার করলেন; কিন্তু ইংল্যাণ্ড তাঁর স্পষ্টবাদিতা ক্ষমা করলে না। Lady Chatterley's Lover বাজেয়াপ্ত হল। ভিক্টোরীয়ান সংস্কারের তিনি বিরুদ্ধে গেলেন বটে, কিন্তু ভিক্টোরীয়ান ভাবপ্রবণতা থেকে মুক্তি পেলেন না, তথাপি লরেন্সকেই আজ পর্য্যন্ত ইংরেজি সাহিত্যে একমাত্র প্রেম-বিশ্লেষক বলা চলতে পারে। প্রেম সেখানে এক ভিন্ন সত্তা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, পটভূমিকায় পর্য্যবসিত হয়নি। এর পরেই লরেন্সকে অনুসরণ করে ভালোবাসার কথা যিনি বলতে চেয়েছেন তিনি অল্ডাস হাক্সলী, যদিও তাঁর নায়ক-নায়িকাদের অতি-মার্জ্জিত এবং বুদ্ধিদীপ্ত প্রেমালাপ মনকে শেষ পর্য্যন্ত ক্লান্তই করে, সততা থেকে তা বঞ্চিত।

হেপেনষ্টলের The Blaze Of Noon বইখানি সেদিক থেকে সার্থক হয়েছে কিনা বিচার-সাপেক্ষ। গল্পটি একটি অন্ধ ম্যাসাজিষ্টের কাহিনী—প্রথম-পুরুষে কথিত। Rose Gwavas-এ আসবার পর সোফিকে সে ভালোবাসলো, তারপর এলো এমিটি হ্যাল; বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল সব; নায়কের মানসিক দ্বন্দ্ব উঠলো প্রখর হয়ে। সোফির বিগত জীবন দিয়ে সে গড়ে তুলেছে তার সত্তা, সে-সত্তাকে চূর্ণ করে নায়কের সঙ্গে সে মিলিত হতে পারছে না, অন্য দিকে বোবা আর অন্ধ মেয়ে এমিটি; তার বিগত জীবন নেই, না গড়ে উঠেছে তার চরিত্র। পুরুষ চিরদিন চেয়েছে নারীর দায়িত্ব বহন করে তার ব্যক্তিত্বকে প্রতিভাত করতে। তাই জন্ এবং নায়ক লুই দু'জনকেই এমিটি আকর্ষণ করলো। জন্ আর এমিটির পরিণয় জটিলতাকে নিষ্কৃতি দিলে, লুই আর সোফির মিলনেও আর বাধা রইলো না।

অন্ধের কাহিনী হলেও অন্ধতা এর প্রধান উপজীব্য নয়। অন্ধতার আবরণ লেখক ভালোবাসাকে স্পষ্টতা দেবার জন্যই ব্যবহার করেছেন। চোখের দৃষ্টি প্রেমের প্রথম সঞ্জীবনী-মন্ত্র যা প্রতি রমন্যাসের একমাত্র অবলম্বন। এই বইখানিতে তার সন্ধান পাওয়া যায়নি, সুতরাং দৃষ্টির সহযোগে লরেন্স যে-প্রেমের বিশ্লেষণ করেছেন, চোখের অসহযোগ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে হেপেনষ্টলের রচিত প্রেম তা থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

দ্বিতীয়তঃ লরেন্স যৌন-মিলনের বর্ণনায় উচ্ছ্বাসের উষ্ণ প্রাচুর্য্যে অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত, হেপেনষ্টল সেখানে সহিষ্ণু বিশ্লেষক। প্রেমে উচ্ছ্বাস অচল, কেননা উচ্ছ্বাসে অতৃপ্তি এ-সত্য তিনি পরিস্ফুট করে তুলেছেন, এবং এখানে তাঁর নির্ভিক স্পষ্টবাদিতার কাছে লরেন্স কতকাংশে স্তিমিত। ফরাসী লেখক জুলে রোমার লেখায় আমরা এই অনুচ্ছ্বসিত প্রেমের সন্ধান পেয়ে তৃপ্ত হয়েছি।

কাহিনী-রচনার উদ্দেশ্যে চক্ষু ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য (এমিটির উপাখ্যানে শুধু স্পর্শেন্দ্রিয়কেই ব্যবহার করেছেন) নিয়েছেন বলেই এই অভিনবত্ব। রমন্যাসের সরল পথ অতিক্রম করে তাঁকে ডিটেক্টিভ্ জটিলতায় গিয়ে পড়তে হয়েছে, সুতরাং ভাবপ্রবণতার সুযোগ ঘটেনি।

হেপেনষ্টলের প্রেমের আইন কানুন সৃষ্টিছাড়া না হোক ইংরেজি নয়, এবং কোন প্রাদেশিকতার সীমারেখাও সেখানে টেনে দেয়া যায় না। টেক্‌নিকের দিক থেকে প্রথম দৃষ্টিতে একে মৌলিকত্বহীন বলা চলতে পারে—কেননা প্রথম পুরুষে কথিত কাহিনী সাহিত্যে পুরোণো। কিন্তু লেখক যে বিষয় নির্ব্বাচন করেছেন এবং তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ প্রথম পুরুষ ব্যতিরেকে এমন জীবন্ত হয়ে উঠতো কিনা সন্দেহ।

রজত সেন

পথ ও বিপথ (একাঙ্ক নাটক) —আবদুল ওদুদ প্রণীত। (প্রকাশক : বিশ্বভারতী)।

প্রত্যেক দেশেই জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব কৃষ্টি ও সাহিত্যের উপর যথেষ্ট পড়ে। বর্ত্তমান চীনে যে বিরাট গণ-সংহতি ও সংগ্রাম চলছে তার বিস্তৃতি শুধু রাজনৈতিক গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি, তার প্রকাশ আমরা পাই চীনের জাতীয় জীবনের ভাবধারা, কৃষ্টি ও সাহিত্যের মধ্যেও। আমাদের দেশে কিন্তু এরকমের সাহিত্যের অভাব এখনও রয়েছে। ভারতীয় গণ-আন্দোলনের সম্বন্ধে বই খুব কম বের হয়েছে : সেই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সাহিত্য গড়ে তুলবার প্রয়োজনীয়তাবোধই এখন পর্য্যন্ত স্পষ্টভাবে সত্যিই মেনে নেওয়া হয়নি। সেই কারণে এই ছোট নাটকটির সমাদর হওয়া একান্ত বাঞ্ছিত।

এই নাটকটির মধ্যে দিয়ে লেখক দেখাতে চেয়েছেন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কতকগুলি জরুরী সমস্যা। সেগুলির সমাধান সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন চরিত্রের আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়ে। নাটক হিসাবে হয় ত বইটির মূল্য খুব বেশী নয়, কিন্তু এই সব মতামতের সমষ্টি হিসাবে বইটি সকলের পড়া উচিত।

সুজিত ও আলিগওহরের তর্ক-বিতর্কের মধ্যে আমরা একটা কথা বারবার শুনতে পাই, এবং সেই কথাটি আমাদের জাতীয় আন্দোলনের একটি বড় সমস্যা। সুজিতের মতে আমরা এখন জাতীয় আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত থাকব। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য দেশের সমস্ত শক্তি একত্র করতে হবে। ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান এ' সব কথাই আজ ভুলে যেতে হবে : আজকে সকলে একত্র হয়ে মুক্তি-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হই। তাই শ্রেণী-সংগ্রামের স্থান আজ ভারতবর্ষে নেই ; এখন শুধু জাতীয় সংগ্রামের দিন।

এরকম মত প্রকাশ নতুন নয়। অনেক জাতীয়তাবাদীর মতেই সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা আজ আমাদের দেশে বাঞ্ছনীয় নয়—কারণ তাতে নাকি আমরা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য ভুলে যাব। কিন্তু এরকম মতের মধ্যে একটা মস্ত বড় গলদ রয়ে গিয়েছে। সেটা হ'ল যে, শ্রেণী-সংগ্রাম ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের পারস্পারিক সম্বন্ধ। একটা বাদ দিয়ে আর একটা আজ সম্ভব নয়। আজ কংগ্রেসের বুর্জ্জোয়া নেতৃত্ব রয়েছে বলে যে জাতীয় আন্দোলনে শ্রমিক ও কৃষকের নিজ নিজ দাবী, এবং তার জন্য সংহতি ও আন্দোলনের প্রয়োজন নেই, একথা বলা ভুল হবে। শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই জাতীয়-সংগ্রামের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। জাতীয় আন্দোলনের প্রধান

শক্তি রয়েছে কোটি কোটি কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে। শুধু বুর্জ্জোয়া নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন সম্ভব হত না। শ্রমিক ও কৃষকই তাদের শ্রেণী-সংগঠনের মধ্যে দিয়ে জাতীয় সংগ্রামকে জয়যুক্ত করতে পারবে। বুর্জ্জোয়া নেতৃত্ব কখনও চাইবে না যে জাতীর পূর্ণ-শক্তি আজ সংগ্রামে নিযুক্ত হোক ; কারণ, তা' করলে বুর্জ্জোয়া নেতৃত্বের নিজের অবস্থা শোচনীয় হ'য়ে পড়ে, তাদের নেতৃত্ব বজায় রাখা মুস্কিল হয় ; তাই তাদের নীতি হবে সংগ্রামের নীতি নয় আপোষের নীতি। তারাও স্বাধীনতা চায়, কিন্তু সংগ্রামকে এড়িয়ে যাতে তাদের নিজেদের স্বার্থের উপর কোনও আঘাত না লাগে।

এই প্রসঙ্গে লেনিন তাঁর বই Two Tactics of Social Democracy in the Bourgeois Democratic Revolution-এ খুব স্পষ্টভাবে বুর্জ্জোয়াদের সমস্যার ব্যাখা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন রাশিয়াতে বুর্জ্জোয়ারা কিরকম বিপ্লব-বিমুখ হয়ে পড়ে, কারণ যদিও তারা জারতন্ত্র-বিরোধী ছিল, তবু সেই শাসনতন্ত্রকে একেবারে ধ্বংস করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না ; বরং সেই শাসনতন্ত্র দখল করে শ্রমিক ও কৃষক ও অন্যান্য সকল শ্রেণীর উপর প্রভুত্ব স্থাপন ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এদিকে শ্রমিক ও কৃষক বুর্জ্জোয়া-গণতন্ত্র স্থাপনের জন্য বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত, কারণ, যদিও সেই শাসনতন্ত্রে তাদের একাধিকার থাকবে না, তবু সেই শাসনতন্ত্রের সাহায্যে তারা সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হতে পারবে এবং শ্রেণী-অত্যাচারের অবসান ঘটাতে পারবে। তাই বুর্জ্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে বস্তুত বুর্জ্জোয়া থেকে শ্রমিক ও কৃষকরাই বেশী অগ্রসর হতে প্রস্তুত। আমাদের দেশেও আজ স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়যুক্ত হবার পন্থা শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। শ্রেণী-সংগ্রামে জাতীয় সংস্কৃতি দুর্ব্বল হয় না, বরং শ্রমিক ও কৃষকের সংগ্রামের ভিতর দিয়ে জাতীয় আন্দোলন পূর্ণ-স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

ফিরিশ্‌তা

নোঙরহীন নৌকা : মনোরঞ্জন হাজরা (গুপ্ত ব্রেদার্স এণ্ড কোং)

সমাজের নীচু স্তরের লোকদের জীবন-আলেখ্য যে 'পদ্মানদীর মাঝি'ই প্রথম বাংলা সাহিত্যে উপস্থিত করেছে তা নয়, তবু এই উপন্যাসখানির জনপ্রিয়তা অসাধারণ। তার কারণ খানিকটা পারিপার্শ্বের অভিনবত্ব এবং অধিকাংশতই মধ্যবিত্ত লেখকসুলভ আবেগময়তা। মাঝিদের জীবন-কাহিনী স্বাভাবিক করতে না পারলেও মাণিকবাবু একে হৃদয়স্পর্শী সাহিত্যের পর্য্যায়ে তুলে এনেছেন। এই মাঝির দলের আছে নদীর মতই নির্বোধ সমাহিতি আর উচ্ছ্বাস, উত্তর সামরিক বিংশ শতাব্দী তাদের জীবনে পৌছুতে পারেনি। তাদের জীবনের দারিদ্র্য এবং দুস্থতা নিয়তিরই নিয়মাধীন। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে সমাজ সম্পর্কে লেখক তাঁর মন বা চিন্তাকে অগ্রসর করে দিতে অনিচ্ছুক। সমাজের দুর্গতদের নিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের উপন্যাস

রচনা করার বিপদ এইখানে : আপন শ্রেণীগত চিন্তাভাবনা পাপপুণ্যের ছকে নিম্নশ্রেণীগত মনোবৃত্তিকে তাঁরা ঠেসেঠুসে খাপ খাইয়ে দিতে চান।

'নোঙরহীন নৌকা'ও সমাজের নীচু স্তরের লোকদেরই জীবন-কাহিনী—নদী-কাহিনীর মত ভাবাবেগ তাতে অনুপস্থিত, বিংশ শতাব্দীর রূঢ় কঠোর বাস্তব এদের জীবনকে স্পর্শ করেছে, কোথাও লেগেছে আগুন—কোথাও ধরেছে ভাঙন। এই হিসেবে 'নোঙরহীন নৌকা' 'পদ্মানদীর মাঝি'র চেয়ে অনেকাংশে আধুনিক। উপন্যাসটির চরিত্র গাঁয়ের জনকয়েক ভূমিহীন কৃষক—যাদের শ্রমসর্বস্ব মজুরও বলা যায়; তাদের জীবনের যে সামান্যতম সুখ আর অসামান্য দুঃখ, নিপীড়ন, শোষণ দিয়ে আধুনিক কালের ইতিহাস কলঙ্কিত হচ্ছে লেখক তা নির্ভুল বিশ্লেষণে অনাবৃত করে ধরেছেন। একদিকে 'ধনতান্ত্রিক জমিদারী'র সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় এদের শান্তির নীড় ভেঙে পড়ছে—অন্যদিকে যন্ত্রসভ্যতার নিষ্পেষণে জীবন হয়ে উঠছে যন্ত্রীভূত। নায়ক' 'নিরাপদ' আর তার বোন 'রাধা'র ইতিহাসে আমরা অপরাধী বিংশ শতাব্দীর অভিব্যক্তি দেখতে পেয়েছি, 'আশুবাবু' আর 'অদ্বৈতে' যেমন দেখতে পেয়েছি এ শতাব্দীর ক্ষমাহীন, নিষ্ঠুর ক্ষুধা। তারপর আছে প্রতিবাদহীন 'বনমালী' আর 'সুশীলা'র শুষ্ক নিরুপায় মুখ, 'শঙ্কর' আর 'উষা'র নিষ্ফল বিদ্রোহী সুর। এই পতিত দরিদ্রদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি যে এখনো কুয়াশাচ্ছন্ন, এখনো যে তা স্পষ্ট প্রখর রূপ নিতে পারেনি বর্তমানের এই যুগবৃত্তির চিত্রাঙ্কণেই লেখকের দৃষ্টি-গভীর মন সবচেয়ে বেশি উদ্ঘাটিত হয়েছে।

কিন্তু এ সত্ত্বেও 'নোঙরহীন নৌকা' উপন্যাস হিসেবে সার্থক নয়। আঙ্গিকের দিক থেকেও একে আধুনিক বলা চলে না। ক্লান্তিকর দৃশ্যবর্ণনা, সামাজিক সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা, বক্তৃতামূলক কাব্যভারাক্রান্ত পত্র অতি বড় ধৈর্যবান পাঠককেও চঞ্চল করে তোলে। তাছাড়া, একমাত্র নিরাপদের চরিত্র ভিন্ন অন্য কোনো চরিত্রই রক্তমাংসে তেমন সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। তারপর লেখকের ভাষা—স্বভাবতই তাতে গতির অভাব, তার উপর কাব্যের বোঝার স্থানে স্থানে তা আরো আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। সম্ভবত বইখানি লেখকের প্রথম উপন্যাস বলে এ ত্রুটীগুলো অনিবার্য্য না হয়ে পারেনি।

স.

Published and Printed by K. C. Banerjee at the Modern Art Press, 1/2, Durga Pituri Lane, Calcutta. Edited by Humayun Kabir.

শ্রেষ্ঠতার পরিচয় কর্ম্মে.....

অধিকৃত মূলধন	...	৬,০০,০০,০০০৲ টাকা
গৃহীত মূলধন	...	৩,৫৬,০৫,২৭৫৲ টাকা
আদায়ী মূলধন	...	৭১,২১,০৫৫৲ টাকা
মোট তহবিল	...	২,৫৯,২৩,০৭৪৲ টাকা

প্রায় ৮,০০,০০,০০০৲ টাকা দাবী মিটান হইয়াছে

নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

হেড্ অফিস— বোম্বাই

ESTABLISHED 1919

কলিকাতা শাখা— ৯নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের বলিষ্ঠ কল্পনা যে মনোরাজ্য গঠন করেছে তারই বাণীময় প্রতীক স ম্রা ট স ম্রা ট আধুনিক যুগের কবি-কল্পনার প্রান্তিক পরিণতি - -

স ম্রা ট

প্রেমেন্দ্র মিত্রের নূতন কাব্য-গ্রন্থ

মূল্য — ১৷৷০ টাকা

প্রকাশিতব্য

হুমায়ুন কবিরের

বাংলার কাব্য

প্রাপ্তিস্থান :

ডি, এম্, লাইব্রেরী

৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা